কি শো র ক্লা সি ক

আবার যখের ধন

হেমেন্দ্রকুমার রায়

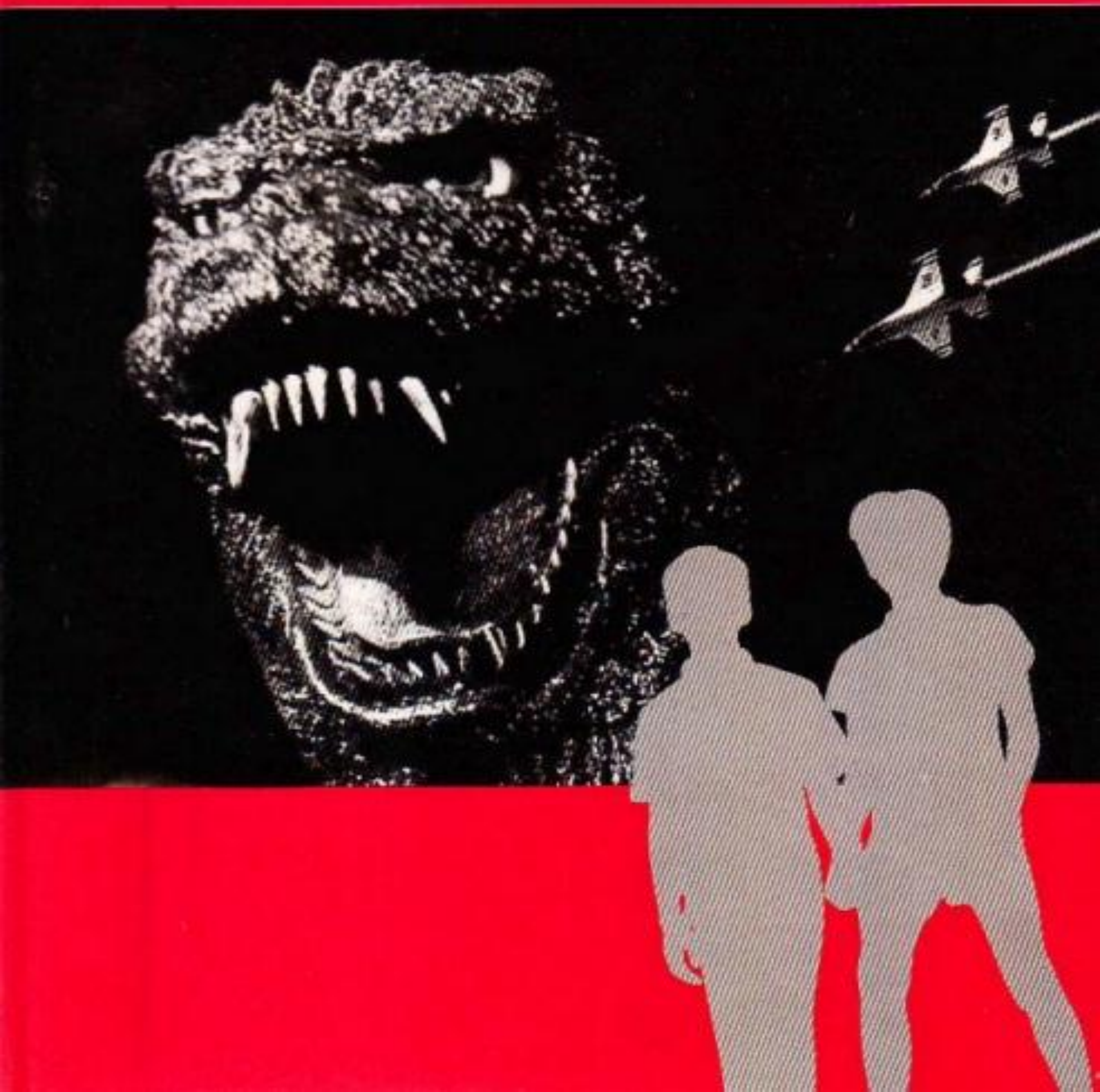

কিশোর ক্লাসিক

আবার যখের ধন

হেমেন্দ্রকুমার রায়

Find More Book!

Gooo...

www.shishukishor.org

ভূমিকা

বছর কয় আগে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত মৌচাকে আমি যখন যকের ধন লিখতে শুরে করি তখন বাংলা সাহিত্যে এ-শ্রেণীর ছেলেদের উপন্যাস একখানিও ছিল না। যকের ধনের অসামান্য সাফল্য এখন অনেক লেখককেই উৎসাহিত করেছে। এবং ছেলেদের উপন্যাস লেখবার জন্য, এদেশে আমার প্রদর্শিত পথে এখন যে কত লোক এসে দাঁড়িয়েছেন, বিভিন্ন পুস্তকালয়ের প্রকাশিত পুস্তক তালিকায় দৃষ্টিপাত করলেই সকলে তা বুঝতে পারবেন। যদিও কোন কোন লেখক যকের ধনের অশোভন অনুকরণ করতেও ছাড়েন নি, তবুও এতগুলি বাঙালি লেখক যে আমার পথ অনুসরণ করে আজ দেশের বাল্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলবার জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন, এজন্য আমি অনায়াসেই, গর্ব নয়, আনন্দ প্রকাশ করতে পারি।

ছেলেরা ভালোবাসে "এডভেঞ্চার"। এবং সে এডভেঞ্চার যত ধারণাতীত, বিপদবহুল ও বিচিত্র হয়ে ওঠে, ততই বেড়ে ওঠে তাদের আগ্রহ। যকের ধন', মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন ও মায়াকানন প্রভৃতি উপন্যাসে আমি তাদের সেই আগ্রহেরই খোরাক যোগাবার চেষ্টা করেছি। বাঙালি ছেলেদের দেহের সাথে মনও যাতে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, স্বদেশকে ভালোবেসেও তাদের চিত্ত যাতে বিপুল বিশ্বের জল-স্থল-শূণ্যে বেপরোয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ে , মৃত্যুবন্ধুর বিপদের পন্থায় তাদের আনন্দের উৎস যাতে অসঙ্কোচে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে, নানা বিরোধী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেও অটল থেকে তারা যাতে নিজেদের জীবন গঠন করতে শেখে, আমার এ শ্রেণীর উপন্যাস রচনার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই। – ইস্কুলের মরা পুঁথির কালির আঁচড়ে ছেলেরা মানুষ হয় না, তারা মানুষ হয় পাঠশালার বাইরে, বিপুল বিশ্বের ভিতর ছুটে বেরিয়ে গিয়ে বিচিত্র living book পাঠ করে। বিজ্ঞ প্রাচীনরা

যা চান না, বাঙালি ছেলেদের আমি তাই হতে বলি। তারা ডানপিটে হোক। তারা আপদ-বিপদের কোলে মানুষ হোক। তারা বীরত্বে মহান হোক্।

আমার এই আবার যখের ধন হচ্ছে বাংলার বাল্যপাঠ্য ঘটনা বহুল উপন্যাসের অগ্রদূত যকের ধনেরই স্বগোত্র। যকের ধন বাংলার ছেলে-বুড়ো সকলেরই কাছে যে মিষ্ট আদর পেয়েছিল, এ -উপন্যাসখানিও যদি তা থেকে বঞ্চিত না হয়, তাহলেই সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করব। অলমতিবিস্তরেণ।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

ভূত না চোর

সন্ধ্যাবেলা। দুই বন্ধু পাশাপাশি বসে আছে। একজনের হাতে একখানা খবরের কাগজ, আর একজনের হাতে একখানা খোলা বই। সামনে একটা টেবিল,—তার তলায় কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে, মস্ত একটা দেশি কুকুর।

একজনের নাম বিমল, আর একজনের নাম কুমার। কুকুরটার নাম হচ্ছে বাঘা । যখের ধনের পাঠকরা নিশ্চয়ই এদের চিনতে পেরেছেন?

কুমার হঠাৎ খবরের কাগজখানা মহাবিরক্তির সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, "খবরের কাগজের নিকুচি করেচে!"

বিমল বই থেকে মুখ তুলে বললে, "কী হল হে? হঠাৎ খবরের কাগজের ওপর চট্‌লে কেন?"

কুমার বললে, "না চ'টে করি কী বল দেখি? কাগজে নতুন কোন খবর নেই। সেই থোড় বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়! নাঃ, পৃথিবীটা বেজায় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে।"

বিমল হাতের বইখানা মুড়ে টেবিলে রেখে দিয়ে বলে, "পৃথিবীকে আর তোমার পছন্দ হচ্ছে না? তাহলে তুমি আবার মঙ্গল-গ্রহে ফিরে যেতে চাও?"

—"না, দেখা দেশ আর দেখতে ইচ্ছে নেই। তার চেয়ে চন্দ্রলোকে যাওয়া ভালো।"

—"ওরে বাস্‌রে, সেখানে ভয়ানক শীত ।"

—"তাহলে পাতালে যাই চল ।"

—"চন্দ্রলোকে গেলেও তোমাকে বোধ হয় পাতালে থাকতে হবে । সেখানে মাটির উপরে চির-তুষারের রাজ্য। পণ্ডিতরা তাই সন্দেহ করেন যে, চন্দ্রলোকের জীবরা পাতালের ভেতরে থাকে।"

—"কিন্তু চন্দ্রলোকে যাব কেমন করে?"

—"সে কথা পরে ভাবা যাবে এখন,..... আপাততঃ রামহরির পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি, বোধ হয় আমাদের জলখাবার আসচে, অতএব—"

রামহরি ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল, তার দুই হাতে দু'খানা খাবারের থালা ।

বিমল বললে, "এস এস, রামহরি এস! রামহরি, তুমি যখন হাসিমুখে খাবারের থালা হাতে করে ঘরে এসে ঢোকো, তখন তোমাকে আমার ভারি ভালো লাগে। আজ কী বানিয়েছ রামহরি?"

রামহরি থালা দু-খানা দুজনের সামনে রেখে বললে, "মাছের কচুরি আর মাংসের সিঙাড়া!"

বিমল বললে, "আরে বাহবা কি বাহবা! হাত চালাও কুমার, হাত চালাও।"

কুমার একখানা কচুরি তুলে নিয়ে বললে, "ভগবান রামহরিকে দীর্ঘজীবী করুন! আমাদের রামহরি না থাকলে এই একঘেয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই মুস্কিল হত।"

মাছ মাংসের গন্ধে বাঘারও ঘুম গেল ছুটে! সেও দাঁড়িয়ে উঠে প্রথমে একটা ডন দিয়ে   চাঙা হয়ে এগিয়ে এসে ল্যাজ নাড়তে শুরু করল।

এমন সময়ে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

বিমল বলল, "দেখ তো রামহরি, কে ডাকে?"

রামহরি বেরিয়ে গেল, খানিক পরে ফিরে এসে বললে, "একজন ভদ্রলোক তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে এসেচি।"

খাবারে থালা খালি করে বিমল ও কুমার নিচে নেমে গেল। বাইরের ঘরে ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না, দিব্য ফর্সা রং, চেহারায় বেশ- একটি লালিত্য আছে।

বিমল বললে, “আপনি কাকে চান?”

ভদ্রলোক বললেন, “আপনাদেরই। আপনারা আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাদের চিনি, আমার নাম মানিকলাল বসু, আমার বাড়ি খুব কাছেই।”

বিমল বললে, “বসুন। আমাদের কাছে আপনার কী দরকার?”

– “মশাই আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমার বাড়িতে বোধহয় ভূতের উপদ্রব হয়েছে।”

বিমল বললে, “কিন্তু সেজন্য আমাদের কাছে এসেছেন কেন? আমরা তো আর রোজা নই।”

মানিকবাবু বললেন, “এ যে সে ভূত নয় মশাই, রোজা এর কিছুই করতে পারবে না। আমি আপনাদের কীর্ত্তিকলাপ সব শুনেছি, তাই আপনাদের কাছে এসেচি।”

বিমল বললে, “আচ্ছা, ব্যাপারটা কী আগে খুলে বলুন দেখি!”

মানিকবাবু বললেন, “ঐ যে বললুম, ভূতের অত্যাচার। আর অত্যাচার বলে অত্যাচার? ভয়ানক অত্যাচার! উঃ!”

বিমল ও কুমার হেসে ফেললে।

– “আপনারা হাসচেন? তা হাসুন কিন্তু আমার বাড়িটা যদি আপনাদের বাড়ি হত, তাহলে আপনাদের মুখের হাসি মুখেই শুকিয়ে যেত। বুঝচেন মশাই, আমার বাড়িটা এখন ভূতের বৈঠকখানা হয়ে দাঁড়িয়েচে!”

– “কী রকম শুনি?”

– “শুনুন তাহলে। ঠিক মাসখানেক আগে আমরা বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেশে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আমার সদর দরজার তালা ভাঙা। ভেতরে ঢুকে দেখি, উঠোনের উপর রূপার বাসন আর আমার স্ত্রীর গয়নাগুলি ছড়িয়ে পড়ে আছে। উপরে উঠে দেখি, প্রত্যেক ঘরের তালা ভাঙা। কোন ঘরে টেবিলের ভিতর থেকে কাগজ-পত্তর বের করে কে ঘরময় ছড়িয়ে রেখে গেছে, কোন ঘরে

লোহার সিন্দুক ভাঙা পড়ে আছে, কোন ঘরে আলমারী ভেঙে কাপড়-চোপড় গুলো কে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেচে। অথচ আমার কিছুই হারায় নি। বলুন দেখি, এসব কী ব্যাপার? চোর এলে সব চুরি করে নিয়ে যেত, কিন্তু আমার চুরি যায় নি। এিকি ভূতুড়ে কাণ্ড নয়?”

বিমল বললে, “তারপর?”

– “দিন পনেরো আগে, অনেক রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠেই শুনলুম আমার টেরিয়ার কুকুরটা বেজায় চিৎকার করছে। তারপরেই সে আর্তনাদ করে চুপ করে গেল। আমি ভয়ে ঘর থেকে বেরুতে পারলুম না। তারপর বাড়ির সবাই যখন জেগে উঠল, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, আমার কুকুরটাকে কে গলা টিপে মেরে ফেলেচে। আর তার মুখে লেগে রয়েচে এক খাব্‌লা লোম।”

বিমল বিস্মিত স্বরে বলল, “লোম?”

—“হ্যাঁ। কিন্তু সে লোম আমার কুকুরের নয়। লোমগুলো আমি কাগজে মুড়ে রেখে দিয়েচি। এই দেখুন না।”-- বলেই মানিকবাবু কাগজের একটি ছোট পুরিয়া বার করে বিমলের হাতে দিলেন।

বিমল পুরিয়াটা খুলে লোমগুলো পরীক্ষা করে বললে, “আচ্ছা, এটা এখন আমার কাছে থাক। তারপর কী হয়েছে বলুন।"

মানিকবাবু বললেন, “কাল রাত্রে কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না। রাত তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে, চারিদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ শুনলুম, আমার বাড়ির ছাদের উপর দুম্ দুম্ করে শব্দ হচ্ছে - সে মানুষের পায়ের শব্দ নয়, মানুষের পায়ের শব্দ অত ভারী হয় না, ঠিক যেন একটা হাতি ছাতময় চলে বেড়াচ্চে। ভয়ে আমার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত যেন খাড়া হয়ে উঠল, কাঁপতে-কাঁপতে কোন রকমে বিছানার উপর উঠে বসলুম ! বাড়িতে এই রকম গোলমাল দেখে আমি একটা বন্দুক কিনেছিলুম। তাড়াতাড়ি সেই বন্দুকটা নিয়ে একটা ফাঁকা আওয়াজ

করতেই ছাতের উপরের পায়ের শব্দ থেমে গেল । রাত্রে আর কোন হ্যাঙ্গাম হয় নি।”

বিমল সুধোলে, “আপনি পুলিসে খবর দিয়েছেন ?”

—“হ্যাঁ। পুলিশ কোনই কিনারা করতে পারে নি।" |

—“দেখুন মানিকবাবু, আপনার সমস্ত কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনার বাড়িতে যারা যারা আসচে তারা সাধারণ চোর নয়। তারা টাকা-পয়সার লোভে আসচে না। আপনার বাড়িতে হয়তো এমন কোন জিনিস আছে, যার দাম টাকা-পয়সার চেয়ে বেশি ।”

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে মানিকবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, “বিমলবাবু, একথা তো আমি একবারও ভাবিনি!.....হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলছেন, আমার বাড়িতে একটা মূল্যবান জিনিস আছে বটে। ইচ্ছে করলে আমি রাজার ঐশ্বর্য পেতে পারি।"

—“তার মানে ?”

—তাহলে গোড়া থেকেই বলচি । আমার বাবার দুই ভাই । মেজো কাকার নাম সুরেনবাবু, ছোট কাকার নাম মাখনবাবু। গেল যুদ্ধের সময়ে আমার দুই কাকাই ফৌজের সঙ্গে আফ্রিকায় যান। তারপর তাদের আর কোন খবর পাইনি। আজ তিন মাস আগে জাঞ্জিবার থেকে হঠাৎ মেজো কাকার এক মস্ত চিঠি পাই । চিঠির মর্ম মেজো কাকার ভাষাতেই আমার যতটা মনে আছে আপনাকে সংক্ষেপে বলচি:

“বাবা মানিক,

আমি এখন মৃত্যুশয্যায়, আমার বাঁচবার কোন আশা নেই। এতদিন তোমাদের কোন খবর নিতে পারিনি, নিজের কোন খবর দিতেও পারি নি। কারণ,

আফ্রিকার এমন সব দেশে আমাকে থাকতে হয়েছিল, যেখান থেকে খবরাখবর পাঠাবার কোনই উপায় নেই ।

এখন কী জন্যে তোমাকে এই চিঠি লিখচি শোনো । ইষ্ট আফ্রিকার টাঙ্গানিকা হ্রদের কাছে এক পাহাড়ের ভিতরে আমি অগাধ ঐশ্বর্য আবিষ্কার করেছি, সে ঐশ্বর্য পেলে অনেক রাজারাজড়ারও মাথা ঘুরে যাবে।

এ-ঐশ্বর্য আমারই হত। কিন্তু সাংঘাতিক পীড়ায় আমি এখন পরলোকের পথে পা দিয়েছি। আমার স্ত্রীও নেই, সন্তানও নেই-কাজেই ঐ ঐশ্বর্যের সন্ধান আমি তোমাকেই দিয়ে গেলুম। ওখানকার সমস্ত ধনরত্ন তুমি পেতে পারো।

এই পত্রের সঙ্গে ম্যাপ পাঠালুম-সেখানি খুব যত্নে সাবধানে রেখো । কোন পথে, কেমন করে, কোথায় গেলে গুপ্তধন পাওয়া যাবে, এই ম্যাপে সব লেখা আছে। আর কেউ যেন এই ম্যাপের কথা জানতে না পায়ে ।

আর একটা কথা মনে রেখো! একলা যেন এই গুপ্তধন নিতে এস না। কারণ দুর্গম পথ, পদে পদে প্রাণের ভয়-সিংহ, বাঘ, বুনো হাতি, হিপো, গণ্ডার, সাপ | অসভ্য জাতি আর নানান রকম ব্যাধি, কখন যে কার কবলে প্রাণ যাবে, কিচুই বলা যায় না। এ-সব বিপদ যদি এড়াতে পারবে বলে মনে কর, তবেই এস,–নইলে নয়।

চিঠির সঙ্গে গুপ্তধনের একটা ইতিহাস দিলুম, পড়ে দেখলে অনেক সুবিধা হবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। -

- ইতি তোমার মেজো কাকা ।”

–বিমলবাবু, আপনি কি মনে করেন, ঐ ম্যাপের জন্যেই আমার ওপরে অত্যাচার হচ্ছে? কিন্তু এ-সব কথা তো আমি আর কারুর কাছেই বলি নি!”

বিমল খানিক্ষণ ঘরের ভিতর নীরবে পায়চারী করে বললে, “কাকার চিঠি আর ম্যাপ এখনো আপনার কাছেই তো আছে।”

–“নিশ্চয়ই! সেই চিঠি আর ম্যাপ আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ভিতরে পুরে আমার পড়বার ঘরে বইয়ের আলমারির মধ্যে রেখে দিয়েছি। সেখান থেকে কেউ তা খুঁজে বার করতে পারবে না ।" । -

—“আপনার মেজোকাকার চিঠি পেয়েছেন, মাস তিনেক আগে?”

_“হ্যাঁ ।”

—“আর ঠিক তার দু'মাস পরেই আপনার বাড়িতে উপদ্রব শুরু হয়েছে। এতেও কি আপনি বুঝতে পারছেন না যে, চোরেরা ঐ ম্যাপখানাই চুরি করতে চায়?”

—“এ চোরেরা কি অন্তর্যামী? ম্যাপের কথা এতদিন খালি আমি জানতুম, আর আজ আপনারা দুজনে জানলেন।”

- এমন সময়ে বাঘা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। একবার মানিকবাবুর পা দুটো গম্ভীরভাবে শুঁকে দেখলে, তারপর পথের ধারের একটা জানলার কাছে গিয়ে গর-গর করতে লাগল।

মানিকবাবু বললে, “ওকি মশাই, আপনার কুকুর অমন করে কেন? কামড়াবে নাকি?”

বিমল এক লাফে জানলার কাছে গিয়ে দেখলে, বাইরে রোয়াকের উপরে হুমড়ি খেয়ে বসে কে একটা লোক জানলায় কান পেতে আছে! সে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেল, কিন্তু পারলে না! লোকটা তড়াক করে রোয়াকে থেকে নেমে রাস্তায় পড়েই তীরের মত ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মানিকবাবু বললেন, “ও আবার কী?”

কুমার বললে, “চোরেরা আপনার পিছনে চর পাঠিয়েছিল।”

—“আমার পিছনে ও বাবা, কেন?"

—"কেন আর, আপনি আমাদের এখানে কেন আসছেন, তাই জানাবার জন্যে । আপনি ম্যাপখানা কোথায় রেখেছেন, লোকটা নিশ্চয়ই তা শুনতে পেয়েছে।"

মানিকবাবু আবার চেয়ারের উপর হতাশ ভাবে বসে পড়ে বললেন, "তাহলে এখন উপায়?"

বিমল বললে, "উঠুন মানিকবাবু, শীগ্‌গির বাড়িতে চলুন। আজ রাত্রে চোরেরা নিশ্চয়ই আপনার বাড়ি আক্রমণ করবে। আজ আমরাও আপনার বাড়িতে পাহারা দেব।"

ভূত ও মানুষ

রাত দশটা বেজে গেছে। তারা মানিকবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো।

মানিকবাবুর বাড়ি একেবারে গঙ্গার খালের ধারে । প্রথমে খাল, তারপর রাস্তা, তারপর একটা ছোট মাঠ, তারপরে মানিকবাবুর বাড়ি। জায়গাটা কলকাতা হলে কি হয়, যেমন নিরালা, তেমনি নির্জন আর বাড়ি-ঘরগুলোও খুব তফাতে-তফাতে।

আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু সে চাঁদে নামরক্ষা মাত্র। চারিদিকে প্রায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন-আশপাশের গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল, ঠিক যে কালোর কোলে জমাট বাঁধা অন্ধকারে গাছ।

বিজলি-মশালের (ইলেকট্রিক টর্চ) আলোটা একদিকে ফেলে বিমল বললে, "মানিকবাবু, আপনার বাড়ীর গায়েই ঐ যে মস্ত-বড় গাছটা ছাত ছাড়িয়ে ওপরে উঠেছে, ওটা বোধ হয়, বটগাছ ?"

মানিকবাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

সন্দেহপূর্ণ নেত্রে গাছের চারিদিকে আলো দেখতে-দেখতে বিমল কয়েক পা এগিয়ে গেল।

মানিকবাবু কৌতূহলী হয়ে বললেন, "কী দেখছেন বলুন দেখি ?"

—"দেখচি ও-গাছের ভেতরে কেউ লুকিয়ে আছে কি না ?"

—"ও বাবা, সে কি কথা! ও-সব দেখে শুনে দরকার নেই মশাই, চলুন, আমরা বাড়ির ভেতরে গিয়ে দরজার খিল লাগিয়ে বসে থাকিগে ?"

—"কিন্তু ওরা যদি ঐ গাছ থেকে লাফিয়ে বাড়ির ছাতে গিয়ে ওঠে, তাহলে সদর দরজায় খিল লাগিয়ে করবেন কি ?"

—"গাছ থেকে লাফিয়ে ছাতে গিয়ে উঠবে ? অসম্ভব!"

—"কেন ?"

—“গাছ থেকে আমার বাড়ির ছাত হচ্ছে এগারো বারো হাত তফাতে। মানুষ অত লম্বা লাফ মারতে পারে না!”

বিমল এগিয়ে গিয়ে গাছ আর বাড়ির ব্যবধান দেখে কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বললে, “না, আপনার কথাই সত্যি বটে। কিন্তু আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, তবে বাইরের লোক আপনার বাড়ির ভেতর গিয়ে কী করে ঢোকে ?” .

—“আমিও ভেবে কোন কূল-কিনারা পাই না মশাই ।” বিজলি-মশালের আলোটা বাড়ির দেওয়ালের গায়ে ঘুরিয়ে বিমল বললে, “হয়েচে । ছাত থেকে বৃষ্টির জল বেরুবার ঐ যে তিন-চারটে নল রয়েছে, চোরেরা নিশ্চয়ই ঐ নল বেয়ে ওপরে ওঠে।”

—ও বাবা, বলেন কী ? ব্যাটাদের কি পড়ে মরবার ভয় নেই ?”

বিমল বললে, “চলুন, এখন আমরা বাড়ির ভেতরে যাই ।” মানিকবাবু এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তেই একজন চাকর ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে ।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে বিমল বললে, “ মানিকবাবু, আজ সদর দরজা ভিতর থেকে একেবারে তালা বন্ধ করে দিন। কেউ যেন আর দরজা না খোলে।”

মানিকবাবু সেই হুকুম দিলেন।

বিমল বললে, “আচ্ছা, আপনার চাকর-বাকরেরা সব বিশ্বাসী তো ?”

—“আজ্ঞে, তাদের কারুকে সন্দেহ করবার উপায় নেই। সব পুরানো চাকর । কেবল--”

—“কেবল কী ? বলুন, থামলেন কেন ?"

--"কেবল একজন নতুন লোক আছে।”

—“নতুন ? কতদিন তাকে রেখেচেন ?”

—“সবে কাল সে এসেছে।”

--“আপনি তাকে চেনেন না ?”

—“না। কিন্তু তাকেও সন্দেহ করবার কারণ দেখি না। দিব্যি ভদ্দর-চেহারা, আর চেহারা দেখেই তাকে রেখেচি।"

—“আচ্ছা, তাকে একবার ডাকুন দেখি ?" যে চাকরটা সদরে তালা বন্ধ করেছিল, তার দিকে ফিরে মানিকবাবু বললেন, "ওরে, রামুকে একবার ডেকে দে তো ?”

সে বললে, “আজ্ঞে, রামু বোধ হয় বেরিয়ে গেছে।”

—“বেরিয়ে গেছে?”

—“আজ্ঞে, ঠিক বলতে পারছি না, তবে তাকে খানিকক্ষণ আর দেখতে পাচ্ছি না।” মানিকবাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন, “আমি না বারণ করেছিলুম, সন্ধ্যের পর কারুকে বাড়ি থেকে বেরুতে ?”

বিমল বললে, “থাক মানিকবাবু, এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করে কাজ নেই। আমরা এখন আপনার পড়বার ঘরে যেতে চাই ।”

মানিকবাবু বললেন, “চলুন।”

কুমার চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে, “সেই ঘরেই তো আপনার কাকার চিঠি আর ম্যাপখানা আছে?” । -

— হ্যাঁ।”

পড়বার ঘরের দরজার কাছে এসেই মানিকবাবু সচমকে রলে উঠলেন, “এ কি!”

কুমার বললে, “কী হয়েচে মানিকবাবু?”

মানিকবাবু হতভম্বের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, “এ—ঘরের তালা খুলল কে ?”

বিমল বললে, “আপনি তালা দিয়ে গিয়েছিলেন তো?”

—“আলবৎ। আমি নিজের হাতে ঘরে তালা দিয়ে দিয়েছি। বিমল এক ধাক্কা মারতেই দরজা খুলে গেল। সর্ব্বাগ্রে ঘরের ভিতর ঢুকে বললে, “মানিকবাবু,

আমি যে ভয় করেছিলুম তাই বুঝি ঠিক হল। দেখুন দেখুন ম্যাপ আর চিঠিখানা এখনো আছে কিনা?"

মানিকবাবু তীরের মতো ঘরের ভিতরে ঢুকে আগে গিয়ে একটা আলমারি খুলে ফেললেন। তারপর তাড়াতাড়ি একখানা মোটা বই বার করে খানকয়েক পাতা উল্টে হতাশভাবে বললেন, "সর্বনাশ হয়েচে, সে চিঠিও নেই, ম্যাপও নেই।"

কুমার বললে, "না মানিকবাবু, আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়েচি।"

মানিকবাবু কপালে করাঘাত করে বললেন, "ঠিক সময়ে এসে পড়েচি না ছাই করেচি । আমার..........."

কুমার বাধা দিয়ে বললে, "আগে ঐ টেবিলের তলায় তাকিয়ে দেখুন!"

মানিকবাবু ও বিমল ঘরের কোণে একটা টেবিলের তলার দিকে চেয়ে দেখলে, কে একজন লোক সেখানে হুমড়ি খেয়ে বসে আছে।

কুমার বললে, "চুরি করে চোর এখনো পালাতে পারে নি!"

বিমল এগিয়ে গিয়ে লোকটার পা-দুটো দু-হাতে ধরে তাকে হিড় হিড় করে টেনে বার করে আনলে !

তার মুখের পানে তাকিয়ে মানিকবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "রামু!"

বিমল বললে, "এই কি আপনার নূতন চাকর ?"

মানিকবাবু বললেন, "হ্যাঁ। – ওরে রাস্কেল, এই জন্যই তুমি আমার বাড়িতে চাক্‌রি নিয়েছ ? সূঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবে ?"

ঠিক সেই সময়ে ঘরের ছাতের উপর শব্দ হল ধুপ্-ধুপ্-ধুপ্ ! মানিকবাবু সেদিন কিছু ভুল বলেন নি, ছাতময় যেন একটা হাতি চলে বেড়াচ্ছেই বটে। প্রত্যেক পায়ের চাপে ঘরখানা পর্যন্ত কেঁপে-কেঁপে উঠছে, মানুষের পায়ের শব্দ এমন-ধারা হয় না!

মানিকবাবু ভয়-শুকনো মুখে বললেন, "ঐ শুনুন নিচে চোর, ওপরে ভূত! আমি এবারে গেলুম!"

কেবল পায়ের শব্দ শুনে ভয় পাবার ছেলে বিমল ও কুমার নয়। আসামের পাহাড়ে, মঙ্গল-গ্রহে ও মায়া-কাননে গিয়ে তারা যে-সব অমানুষিক বিপদের কবলে পড়েছিল, তার কাছে এ-তো তুচ্ছ ব্যাপার! সুতরাং তারা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল, শব্দটা ধীরে ধীরে ছাতের পূর্বদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিমল বললে, “মানিকবাবু, ছাতের পূর্ব দিকে কি আছে!”

–“নিচে নামবার সিঁড়ি!”

—“তাহলে ছাতে যার পায়ের আওয়াজ শুনচি, সে বোধ হয় আমাদের সঙ্গেই আলাপ করতে আস্চে।"

মানিকবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, “ও বাবা, সে কি কথা!”

বিমল বললে, “এস কুমার, আমরা আগে এই লোকটাকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখি। তারপর যে মহাপুরুষ আসচেন তাকে ভালো করেই অভ্যর্থনা করব। বিমল ও কুমার রামুর হাত পা বাঁধতে লেগে গেল।

মানিকবাবু দৌড়ে গিয়ে দেওয়ালের উপর থেকে তার নতুন কেনা বন্দুকটা পেড়ে নিলেন। তারপর খোলা-জানারার দিকে ফিরে, প্রাণপণে দুই চক্ষু মুদে মুখ সিটকে দুম করে একবার বন্দুক ছুড়লেন এবং ধপাস করে একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়লেন। ছাতের ওপরে পায়ের শব্দ থেমে গেল!

কুমার বললে, “ওকি মানিকবাবু, চোখ মুদে আছেন কেন?”

মানিকবাবু বললেন, “ও বাবা, বন্দুক ছোঁড়া কি সোজা কথা?”

বলেই আর একবার বন্দুক ছুঁড়লেন তেমনি মুখ সিটুকে ও দুই চক্ষু মুদে। ছাতের ওপরে পায়ের শব্দ আবার ধুপ্ ধুপ্ করে ঘর কাঁপিয়ে এবারে এগিয়ে গেল পশ্চিম দিকে,–তারপরেই যে আওয়াজ হল তাতে বোঝা গেল যে, কেউ ছাত থেকে পাশের বটগাছের ওপরে লাফিয়ে পড়ল ।

মানিকবাবুর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে বিমল রললে, “শিগগির টোটা দিন–শিগগির!”

মানিকবাবু তাড়াতাড়ি উঠে টোটা এনে বিমলের হাতে দিলেন। বিমল বন্দুকে টোটা ভরতে-ভরতে বললে, "কুমার, তুমি টর্চের আলোটা মাঠে ফেলে দেখ, গাছ থেকে কে নামচে?"

কুমার বিজলি-মশাল জ্বেলে জান্‌লার কাছে গেল এবং বিমলও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মশালের আলো অত দূরে ভালো করে পৌঁছালো না কেবল অস্পষ্টভাবে এইটুকু দেখা গেল যে চার-পাঁচটা মূর্তি মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে এবং তার মধ্যে একটা মূর্তি হচ্ছে মিশমিশে কালো -- আকারে প্রকাণ্ড ও তার দেহে একখণ্ড বস্ত্র পর্যন্ত নেই।

মনিকবাবু জানলা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখেই ভূত ভূত বলে চেঁচিয়ে উঠে পিছিয়ে এলেন ।

কুমার বিস্মিতস্বরে বললে, "কী ও? মানুষের মতন দেখতে অথচ..."

বিমল মুখ ফিরিয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বললে, "আর বন্দুক ছোঁড়া মিছে। নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েচে ।"

মানিকবাবু বললেন, "কিন্তু কী দেখলুম। বিমলবাবু! ভূত আর মানুষ একসঙ্গে ছুটচে ?"

বিমল বললে, "ব্যাপারটা আশ্চর্য বটে, আমিও কিছু বুঝতে পারলুম না; কিন্তু সেকথা পরে ভাবা যাবে এখন। আপাতত শ্রীমান রামুর সঙ্গে একটু গল্প করা যাক। কী বল রামু ? তাহলে আজ সন্ধ্যের সময়ে তুমিই বোধ হয় আমার বাড়িতে আড়ি পাততে গিয়েছিলে ?"

রামু কোন জবাব দিলে না।

—"কিহে, কথা কইচ না যে বড়? মৌনী-বাবা হয়ে ধ্যান করচ নাকি ?"

রামু মুখ খুললে না। কুমার বললে, "ওহে বিমল, রামু কথা না কইল তো বড় বয়ে গেল! ওর কাছে যে চিঠি আর ম্যাপ আছে তাই নিয়েই আমাদের দরকার।"

—"যা বলেচ!" বলে বিমল রামুর জামা-কাপড় সব হাতড়াতে লাগল! কিন্তু চিঠি ও ম্যাপ পাওয়া গেল না। বিমল তাকে খুব খানিক ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "সেই চিঠি আর ম্যাপ কোথায়?"

রামু চুপ।

- মানিকবাবু ক্ষাপ্পা হয়ে ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে এসে বললেন, "তোর বোবার নিকুচি করেচে! এখুনি মেরে হাড় ভেঙে দেব জানিস?"

রামু বললে, "আমার কাছে কিছু নেই।"

—"নেই? চালাকি পেয়েছিস? নেই তো গেল কোথায়?"

–"যারা এসেছিল তারা নিয়ে গেছে!"

মানিকবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

দানবের আক্রমণ

চোরেরা গুপ্তধনের ইতিহাস আর ম্যাপখানা নিয়ে গেছে শুনে মানিকবাবুর যে অবস্থা হল তা আর বলবার নয়। সেই-যে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, আর উঠলেন না, কথাও কইলেন না ।

দেখে কুমারের বড় দুঃখ হল।

বিমলের মুখ দেখে বোঝা গেল, রামুর কথায় তার বিশ্বাস হয় নি ।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সে বললে, “মানিকবাবু, আমার বোধ হচ্ছে রামু মিছা কথা বলচে । যারা এসেছিল তারা ম্যাপ আর চিঠি নিয়ে যেতে পারে নি”

মানিকবাবু নিরাশ-মুখে বললেন, “কী করে জানলেন, আপনি?”

“ম্যাপ আর চিঠি তারা যদি নিয়েই যাবে, তাহরে রামুও তাদের সঙ্গে পালায় নি কেন? রামু তো ঐ দুটো জিনিসই চুরি করবার জন্যে আপনার বাড়িতে চাকর সেজে আছে? তবে কাজ হাসিল হবার পরেও সে এঘরের ভেতর কী করছিল?”

রামু বললে, “আপনারা হঠাৎ এসে পড়লেন যে! কেমন করে আমি পালাব?"

বিমল বললে, “কিন্তু আমারা আসবার পরেও ম্যাপ আর চিঠি পেয়েও তোমার দলের লোকেরা ছাতের ওপরে অপেক্ষা করছিল কেন?.. না মানিকবাবু, আপনার চিঠি আর ম্যাপ বোধ হয় এইখানেই কোথাও আছে! আসুন, আমরা আর একবার ভালো করে খুঁজে দেখি ।”

তন্ন তন্ন করে প্রায় একঘন্টা ধরে তারা ঘরের চারিদিক খুঁজল, কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। তাদের দিকে তাকিয়ে রামু ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

মানিকবাবু ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, “পোড়ার মুখে আবার হাসি হচ্ছে! দেব ঠাস করে গালে এক চড়, হাসি একেবারে বেরিয়ে যাবে!”

বিমল বললে, রামু, ভালো চাও তো এখনো বল, ম্যাপ আর চিঠি কোথায় গেল?”

—“যারা নিতে এসেছিল তারা নিয়ে গেছে।"

--"কে তারা? কোথায় থাকে?” রামু জবাব দিলে না ।

মানিকবাবু বললেন, “সহজে তুমি জবাব দেবে না-নয়? দেখবে তার মজাটা?”

রামু বললে, “আমাকে মেরে ফেললেও আমার পেট থেকে আর কোন কথা বেরুবে না ।”

বিমল বললে, “মানিকবাবু, ওকে নিয়ে আর সময় নষ্ট করে কাজ নেই। আজকের মতো ওকে থানায় পাঠিয়ে দিন তার পরে ও মুখ খোলে কি না দেখা যাবে!”

মানিকবাবু তাই করলেন, দু'জন লোকের সঙ্গে রামুকে থানাতে পাঠিয়ে দিলেন।

বিমল বললে, “আজ বৈকালে বেশ এক পশলা বৃষ্টি পড়েছিল। আমি আসবার সময়েই দেখেচি মাঠের মাটি এখনো ভিজে আছে।”

কুমার বললে, “তুমি একথা বলচ কেন?”

—“বটগাছের আশে পাশে ভিজে মাটির ওপরে চোরেদের পায়ের দাগ নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যাবে। এগুলোর আমি একবার পরীক্ষা করতে চাই ।”

মানিকবাবু হতাশভাবে বললেন, “তাতে আর আমাদের কী সুবিধে হবে?”

বিমল বললে, “সুবিধে হয়তো কিছুই হবে না। তবে পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কী? অন্তত এটা বুঝতে পারব তো, চোরদের দলে ক'জন লোক ছিল!”

বিমল এগুল, তার সঙ্গে সঙ্গে কুমারও অগ্রসর হলো । মানিকবাবুও নিতান্ত নাচারের মতন তাদের পিছনে পিছনে নিচে নেমে এলেন । সদর-দরজা পার হয়ে মাঠের উপর পড়েই বিমল বিজলি মশালের আলো চারিদিকে ফেলতে ফেলতে বললে, “মানিকবাবু এতক্ষণ আমরা কি ঐ ঘরে ছিলুম?”

–“হ্যাঁ।”

কুমার, এ ঘরের ঠিক নিচেই মাঠের ওপর সাদা কি-একটা পড়ে আছে দেখ তো?”

কুমার এগিয়ে গিয়ে বললে, “কাগজের একটা মোড়ক।”

মানিকবাবু এক লাফ মেরে বললেন, "কাগজের মোড়ক? কাগজের মোড়ক? কৈ, দেখি--দেখি!” কুমার মোড়কটা নিয়ে এল।

মানিকবাবু মোড়কটা সাগ্রহে টেনে নিয়ে মহা উল্লাসে বলে উঠলেন, “এই যে আমার হারানিধি। এরই ভেতরে সেই চিঠি আর ম্যাপ আছে।”

বিমল বললে, “যা ভেবেচি তাই! আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম, চিঠি আর ম্যাপ চোরেরা নিয়ে যেতে পারে নি! আমরা এসে পড়াতে পালাবার পথ-না-পেয়ে রামু ঐ কাগজের মোড়কটা জান্‌লা গলিয়ে মাঠে ফেলে দিয়েচে!”

মানিকবাবু কাগজের মোড়কটা ভিতরকার জামার পকেটে রেখে দিয়ে বললেন, “উঃ! বিমলবাবু আপনার কি বুদ্ধি!”

বিমল বললে, “বুদ্ধি সকলেরই আছে মানিকবাবু! তবে কেউ তা খেলাতে পারে, আর কেউ তা খেলাতে পারে না ... যাক আপনার জিনিস তো ফিরিয়ে পেলেন, এখন ঐ গাছের কাছে গিয়ে পায়ের দাগগুলো দেখে আসি চলুন।”

বটগাছের কাছে গিয়ে বিজলি-মশালের আলোতে দেখা গেল, ভিজে কাদার ওপরে নানা আকারের অনেকগুলো পায়ের দাগ। বিমল সেইখানে বসে কাগজ আর পেন্সিল বার করে একে একে দাগগুলোর মাপ নিলে । তারপর

বললে, “চোরেদের দলে লোক ছিল পাঁচজন । কিন্তু সেই পাঁচজনের ভেতর একজন হচ্ছে অসাধারণ লোক!”

কুমার বললে, “অসাধারণ লোক?”

মানিকবাবু বললেন, “অসাধারণ লোক! সে আবার কী?”

বিমল বললে, “এই দাগটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। যার পায়ের এই দাগ, তার পা হচ্ছে সাধারণ মানুষের পায়ের চেয়ে প্রায় দু-গুণ বড়। তার পায়ের বুড়ো-আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলগুলোর চেয়ে অনেকটা তফাতে। সে মাটির ওপরে সমানভাবে পা ফেলে চলতে পারে না। তারপর অন্য-অন্য পায়ের দাগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, এ-দাগটা তাদের চেয়ে কত বেশি গভীর। এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে, এ-একটা খুব লম্বাচওড়া আর ভারি লোকের পায়ের দাগ। এক একটা দাগ যেন এক-একটা গর্ত! কে জানে তার দেহের ওজন কত মণ!... সেইজন্যেই ছাতের ওপরে তার পায়ের শব্দ শুনে মনে-হচ্ছিল, যেন একটা মত্ত হাতি ছাতময় চলে বেড়াচ্ছে।”

কুমার বিস্ফারিতচক্ষে বললে, “একি মানুষের পায়ের দাগ, না দানবের?”

মানিকবাবু ভয়বিহবল কণ্ঠে বললেন, “ও বাবা, চোরের কি একটা পোষা দৈত্য নিয়ে চুরি করতে এসেচে?”

কুমার বললে, “আমরা তো দূর থেকে ছায়ার মতন তাকে একবার দেখেচি! প্রকাণ্ড তার কালো চেহারা-সর্বাঙ্গ উলঙ্গ!"

মানিকবাবু এদিকে ওদিকে তাকিয়ে শুষ্কস্বরে বললেন, “ও বাবা, আমার বুক যে ধুক ধুক করচে। যদি সে আবার ফিরে আসে।”

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “হ্যাঁ, দানবেরই মত বটে। সে যে কি, আমি তা কতকটা আন্দাজ করতেও পেরেচি, কিন্তু ব্যাপারটা আরো ভালো করে তলিয়ে না বুঝে এখন কিছু বলতে চাই না তবে এইটুকু জেনে রাখুন, মানিকবাবু, আমার আন্দাজ যদি সত্যি হয়, তাহলে আমরা সাম্‌না-সামনি পড়লে কিছুতেই এই

দানবের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারব না। আমরা তো দূরের কথা, চল্লিশ-পঞ্চাশজন মানুষকেও সে শুধু-হাতে পরাস্ত করতে পারে" ।"

মানিকবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, "ও বাবা, সে কি কথা।" কুমার বললে, "বিমল, তোমার কথা শুনে মনে হয়, ময়নামতির মায়াকানন থেকে আবার কোন দানব বুঝি আমাদের পিছনে পিছনে কলকাতায় এসে হাজির হয়েচে!"

বিমল মুখ টিপে একটুখানি হাসলে, কোন কথা বললে না।

মানিকবাবু আচম্বিতে বিমলকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। বিমল সবিস্ময়ে বললে, "কী হল মানিকবাবু, কী হল-হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরলেন কেন?"

মানিকবাবু বললেন, "ঐ তারা আবার আসচে!"

বিমল সচমকে দেখলে মাঠে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দুটো ছায়া মূর্তি তীরের মত ছুটতে ছুটতে প্রায় তাদের কাছে এসে পড়েছে।

এক ঝট্‌কান মেরে বিমল তখনি মানিকবাবুর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলে। তারপর দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সিধে হয়ে দাঁড়ালো।

তাদের দেখেই মূর্তিদুটো প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাপরে, গেলুম! ভূতে ধরলে!"

"কে এরা?"

তাদের মুখের ওপরে আলো ফেলেই চিনতে পারলে, যাদের সঙ্গে রামুকে থানায় পাঠানো হয়েছিল এরা হচ্ছে তারাই।

মানিকবাবুর ধড়ে এতক্ষণে যেন প্রাণ এল। তিনি বলে উঠলেন, "কে সতীশ? সুরেন? এমন করে ছুটে আসচ কেন? কি হয়েছে?"

—"বাবু? আপনারা এখানে আছেন? বাঁচলুম। আমরা ভেবেছিলুম সেই ভূতটা এখানে হাজির হয়েছে।"

—"কী বলচ্ সতীশ, তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। ভূত কি?"

—"ভয়ানক ব্যাপার বাবু, ভয়ানক ব্যাপার। আমরা যে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে আসতে পেরেছি, এইটুকুই আশ্চর্য ।"

বিমল বললে, "রামু কোথায়?"

–"হয় পালিয়েচে, নয় ভূতের হাতে পড়েচে ।"

—"বেশি বাজে বোকো না। আগে আসল কথা খুলে বল।"

"বললে হয়তো আপনারা বিশ্বাস করবেন না, তবু না বলেও উপায় নেই। রামুকে নিয়ে আমরা থানায় যাচ্ছিলুম। এত রাত্রে পথে লোকজন ছিল না। আগে ছিল সুরেন, মাঝখানে রামু, আর পিছনে আমি । তারপর শীতলা-মন্দিরের সামনে সেই ঝুপসি অশ্বত্থ-গাছের তলায় গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন-আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখলুম হঠাৎ মস্ত বড় একখানা কালো হাত গাছের উপর থেকে সাঁ করে নেমে এসে সুরেনের গলা ধ'রে তাকে টেনে নিল। তারপর ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার আগেই ওপর থেকে একখানা হাত নেমে এসে আমাকেও ঠিক তেমনি করেই টেনে নিলে। মিনিট-খানেক আমাকে শূণ্যে ঝুলিয়ে রেখেই হাতখানা আবার আমাকে ছেড়ে দিলে -- কিন্তু মাটির ওপরে পড়ে রামুকে আর দেখতে পেলুম না। তারপর আমরা ছুটতে ছুটতে পালিয়ে আসছি।"

বিমল বললে, "রামু তাহলে পালিয়েচে ? মানিকবাবু, রামুর মুখে চোরেরা এতক্ষণে তাহলে শুনেচে যে কাগজের মোড়কটা কোথায় আছে! নিশ্চয়ই তারা আবার এখানে আসবে,—শীগ্‌গির বাড়ির ভেতরে চলুন!"

মানিকবাবু তীরের মত বাড়ির দিকে ছুটলেন। ভিতরে ঢুকেই তিনি বললেন,"তারা আসচে। দরজা বন্ধ করে দাও--দরজা বন্ধ করে দাও!"

বিমল হেসে বললে, "সেই দানবের সামনে দরজা বন্ধ করে কোনই লাভ হবে না! সে যদি আপনার দরজায় এক ধাক্কা মারে তাহলে আপনার দরজা এখনি তাসের বাড়ির মত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।"

মানিকবাবু ভীত মুখে বললেন, "ও বাবা, তার গায়ে এত জোর। তাহলে কী হবে?"

বিমল বললে, "হবে আর কী! আমাদের সঙ্গে বন্দুক আছে, এই যা ভরসা। তাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েই আছি!"

মানিকবাবু বললেন, "না মশাই, আমি মোটেই প্রস্তুত নই। মানুষ হয়ে দানবের সঙ্গে দেখা করব কি! আজ যদি বাঁচি, কালকেই আমি দেশে পালাব।"

ঘটোৎকচের অন্তর্ধান

সবাই আবার উপরের ঘরে এসে উঠলেন । বিমল আগে ঘরের সমস্ত জানলা বন্ধ করে দিলে। তারপর একটা জানলার খড়খড়ি একটুখানি ফাঁক করে রেখে বললে, "কুমার, তুমি এইখানে চোখ দিয়ে বসে থাকো। তারা এলেই খবর দেবে। ততক্ষণে আমি মানিকবাবুর কাকার চিঠিখানা পড়ে ফেলি।"

চিঠিখানা হচ্ছে এইঃ

"স্নেহাস্পদেষু,

মানিক, আমি এখন মৃত্যুমুখে, আমার আর বাঁচবার কোন আশাই নেই। আত্মীয়-স্বজন

হীন এই সুদূর অসভ্যের দেশে থেকে, তোমাদের মুখ না দেখেই আমাকে পরলোকে যেতে হবে, এ কথা কোনদিন কল্পনা করতে পারি নি। এ সময়ে তোমার ছোটকাকাও যদি কাছে থাকত, তাহলে অনেকটা সান্ত্বনা পেতুম। কিন্তু সে হতভাগা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে কোথায় চলে গেছে। হয়তো আমারই মত আফ্রিকার কোন জঙ্গলের ভিতরে তাকেও বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে । কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক!

যুদ্ধের সময় ইস্ট-আফ্রিকায় এসে কিভাবে আমি দিন কাটিয়েছি, সে-সব কথা এখন বলবার দরকারও নেই, সময়ও নেই। আর বেশিক্ষণ আমি বাঁচব না- এখনি চোখে ঝাপসা দেখছি, লিখতে হাত কাঁপচে। নিতান্ত দরকারি কথা ছাড়া আর কিছুই বলবার সময় হবে না।

ইষ্ট-আফ্রিকার যে জায়গাটায় আমি এখন আছি, তার নাম হচ্ছে উজিজি। এটা হচ্ছে আরবদের এক উপনিবেশ । এখানে বেশির ভাগই আরব ও সোহাহিলি জাতের লোক বাস করে। অন্যান্য জাতের লোকও কিছু কিছু আছে। উজিজি ঠিক শহর নয়, একটা মস্ত গ্রাম মাত্র। এই গ্রামটির কাছে আছে মস্ত একটি হ্রদ, তার

নাম টাঙ্গানিকা। এদেশি ভাষায় টাঙ্গানিকা অর্থে বোঝায়, মেলা-মেশার স্থান! টাঙ্গানিকাকে দেখলে সমুদ্র বলেই ভ্রম হয়, কারণ তার এপার থেকে ওপারে নজর চলে না যেন অনন্ত জলরাশি থৈ থৈ করছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে টাঙ্গানিকা আগে সমুদ্রেরই অংশবিশেষ ছিল । পৃথিবীতে টাঙ্গানিকার চেয়ে লম্বা হ্রদ আর দুটি নেই। লম্বায় তা চারশো মাইলেও বেশি এবং চওড়ায় কোথাও পঁয়তাল্লিশ আর কোথাও ত্রিশ মাইল ।

এই বিশাল হ্রদের তীরে এক বুড়ো আরবের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তুমি জানো, দেশে থাকতেই আমার সখ ছিল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা। এখানে এসেও আমি সে সখ ভুলতে পারিনি। অসুখ-বিসুখ হলে স্থানীয় লোকেরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সূত্রেই এই বুড়ো আরবের সঙ্গে আমার আলাপ। বছর তিন আগে বুড়ো আমার ওষুধের গুণে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল । সেই থেকেই সে আমার অনুগত। কেবল অনুগত কেন, আমি তাকে আমার বন্ধু বলেই মনে করতুম।

বুড়োর নাম হচ্ছে টিপ্যু টিব। পাঁচ ছয় মাস আগে সে-বেচারি মারা পড়েছে। তার একমাত্র ছেলে ছিল, গেল বছরে তারও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ গেছে। বুড়োর মৃত্যুকালে কেবল আমি তার কাছে ছিলুম। মৃত্যুর অল্পক্ষণ আগে বুড়ো আমাকে বললে, “বাবু তুমিই এখন আমার মা-বাপ, তুমিই আমার ছেলে । তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তাই আজ আমি তোমাকে এক গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে যেতে চাই ।”

জ্বরের ঘোরে বুড়ো প্রলাপ বকছে ভেবে আমি বললুম, “থাক্ থাক্, ওসব কথা এখন থাক্।”

বুড়ো আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললে, “বাবু, আমার কথা মিথ্যা বলে মনে কোরো না। সত্যি-সত্যিই আমি এমন গুপ্তধনের সন্ধান জানি, যা পেলে তুমি সম্রাটের চেয়েও ধনী হবে।”

আমি বললুম, “এমন গুপ্তধনের সন্ধান সত্য-সত্যই যদি তোমাদের জানা থাকে, তবে তুমি এত গরিবের মত আছ কেন?"

—“গরিবের মত আছি কি সাধে? সে গুপ্তধন যেখানে আছে, সে বড় সহজ ঠাঁই নয়। সেখানে যেতে গেলেও লোকবল, অর্থবল, বাহুবল থাকা চাই! সে-সব কিছুই আমার নেই। কে আমার সঙ্গে যাবে? কাকে বিশ্বাস করব? হয়তো বন্ধু বলে যাদের সাহায্য চাইব, টাকার লোভে তারা আমারই গলায় ছুরি বসাবে। এমনি সাত-পাঁচ ভেবে এতদিন এই গুপ্তধনের ইতিহাস আর কারুর কাছে প্রকাশ করতে বা নিজেও সেখানে যেতে পারি নি। কিন্তু আজ খোদাতালা আমায় ডাক দিয়েছেন, আজ সমস্ত - সাম্রাজ্যও আমার কোন কাজে লাগবে না। তাই তোমাকেই আমি এই গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে যেতে চাই ।”

আমি কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “এ গুপ্তধন কোথায় আছে?”

–“টাঙ্গানিকা হ্রদের ধারে উজিজির দক্ষিণ দিকে কাবেগো পাহাড়ের নাম শুনেছ তো? এই গুপ্তধন আছে তার কাছেই ।”

আমি বললুম, “কিন্তু আমি তার খোঁজ পাব কেমন করে?”

বুড়ো নিজের আলখাল্লার ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে একখানা কাগজ বের করে বললে, “এই নাও একখানা ম্যাপ। এই ম্যাপ দেখলেই তুমি সমস্ত বুঝতে পারবে।”

ম্যাপখানা নিয়ে তার ভিতরে ইংরেজি লেখা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, “এ ম্যাপ তুমি কোথায় পেলে?”

বুড়ো আমার কথার জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ চোখ কপালে তুলে সে গোঁ গোঁ করতে লাগল। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল! অনেক চেষ্টা করেও আর তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারলুম না এবং সেই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হল।

...মানিক, তারপর থেকেই সেই গুপ্তধন ভূতে-পাওয়ার মতন আমাকে পেয়ে বসল। দিন রাত খালি সেই চিন্তা। শেষটা আর থাকতে না পেরে, জন-পনেরো অসভ্য কুলি নিয়ে আমি সেই গুপ্তধনের সন্ধানে যাত্রা করলুম। কিন্তু পথেই রোগ, বন্য-জন্তু আর অসভ্য বুনোদের কবলে পড়ে আমার সাঙ্গপাঙ্গদের অধিকাংশই মারা পড়ল । যথাস্থানে গিয়ে যখন উপস্থিত হলুম, তখন আমার দলে লোক ছিল মাত্র দুজন এবং আমিও পড়লুম জ্বরে। তার ওপরে প্রায় পাঁচ-ছয়শো অসভ্য লোক আমাদের আক্রমণ করতে এল। কাজেই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে কোন গতিকে পালিয়ে এসে আমরা প্রাণরক্ষা করলুম।

অসভ্যদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচালুম বটে, কিন্তু সেই জ্বর হল আমার কাল । আমার ভাগ্যে গুপ্তধন লাভ হল না! কিন্তু গুপ্তধন যে সেখানে আছে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। স্থানীয় লোকদের কাছে শুনে জনেছি, ঐ গুপ্তধনের কাহিনী সেখানে লোকের মুখে মুখে ফেরে। অনেককাল আগে কোন রাজা নাকি সেখানে ঐ গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় তা আছে এ-কথা কেউ জানে না! অনেকেই সেই গুপ্তধনের খোঁজ করেছে, কিন্তু কেউ তা পায়নি। এবং পাছে কেউ তার খোঁজ পায়, সেই ভয়ে সেখানকার অসভ্য জাতিরা সর্বদাই সজাগ হয়ে থাকে এবং কোন বিদেশিকেই সেখানে অগ্রসর হতে দেয় না ।

মানিক, এই গুপ্তধনের সন্ধান আমি তোমাকে দিয়ে গেলুম। সঙ্গে ম্যাপখানি দেখলেই তুমি সমস্ত সন্ধান জানতে পারবে। আমার তো আপন বলতে আর কেউ নেই। তুমি আমার বিষয়ের উত্তরাধিকারী! কাজেই আমার অবর্তমানে তুমিই এই গুপ্তধনের অধিকারী হতে পারবে ।

কিন্তু সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এই গুপ্তধনের লোভে তুমি হয়তো কোন দিনই এখানে আসবে না। তবে যদি কখনো আসো, প্রস্তুত হয়ে আসতে ভুলো না। মনে রেখ, এখানে আসতে গেলে লোকবল, অর্থবল, বাহুবল থাকা চাই।

এখানকার বনে জঙ্গলে সিংহ আছে, চিতাবাঘ আছে, গরিলা, গণ্ডার, বিষাক্ত সাপ, অসভ্য শত্রু ও সাংঘাতিক রোগের ভয় আছে এবং তার ওপরে আছে বিষম পথকষ্ট ।

ম্যাপখানি খুব যত্ন করে লুকিয়ে রেখো। আমি ছাড়া আর এক জন এই ম্যাপের কথা জানে। সে-যে কে, তা আর তোমাকে বলতে চাই না। তবে এর মধ্যেই সে ঐ ম্যাপখানা চুরি করবার চেষ্টা করেছিল। অতএব খুব সাবধান! মনে রেখো, ঐ ম্যাপ হারালে তুমি গুপ্তধনও হারাবে।

আর আমার কিছু বলবার নেই। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি --

আশীর্বাদক -- তোমার কাকা

পুঃ। হ্যাঁ, ভালো কথা তোমরা যদি উজিজিতে আসো, তাহলে এখানে গাটুলা বলে এক বুড়ো সর্দার আছে, তার সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিও। গাটুলা খুব বিশ্বাসী, আর আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। আমি যখন গুপ্তধন আনতে গিয়েছিলুম, তখন সেও আমার সঙ্গে ছিল । পথের খবর সে সব জানে। তাকে সঙ্গে নিলে তোমার অনেক উপকার হবে।”

চিঠিখানা পড়ে বিমল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, “মানিকবাবু, কালকেই আপনার বাড়ির সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দিন। তারপর এ-বাড়িতে তালা বন্ধ করে আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন, চলুন।"

মানিকবাবু বললেন, “আপনার বাড়িতে গিয়ে থাকব? কেন বলুন দেখি?”

—“তাহলে আপনি অনেকটা নিরাপদ থাকতে পারবেন। আমরা তো আর রোজ এখানে এসে পাহারা দিতে পারব না।”

—"কিন্তু বিমলবাবু মাথার ওপরে এ-রকম বিপদ নিয়ে আর কদিন এমন করে চলবে?"

–"আর বেশি দিন নয়, সাত দিন। তারপরেই আমরা আফ্রিকায় যাত্রা করব।"

মানিকবাবু চমকে উঠে বললেন, "ও বাবা, সে কি কথা? আফ্রিকায় যাব কী?"

বিমল বললে, "আফ্রিকায় না গেলে গুপ্তধন পাবেন কি করে?"

মানিকবাবু শুকনো মুখে বললেন, "কাকার চিঠিখানা পড়লেন তো? সেখানে সিঙ্গি আছে, বাঘ আছে, সাপ আছে, গরিলা আছে।"

বিমল বাধা দিয়ে বললে, "হ্যাঁ, পৃথিবীর যত বিপদ সব সেখানে আছে। তা আমি জানি। আর জানি বলেই তো সেখানে যেতে চাচ্ছি। আপনার জন্যে সেখানে গুপ্তধন আছে, আর আমাদের জন্যে আছে বিপদ, কেবল বিপদ। আপনার গুপ্তধনের ওপরে আমাদের কোন লোভ নেই, আমরা চাই খালি বিপদকে। সে বিপদ হবে যত ভয়ানক, আমাদের আনন্দ হবে তত বেশি।"

মানিকবাবু হতভম্বের মতন বললেন, "বলেন কি মশাই?"

কুমার জানলার কাছ থেকে সরে এসে বললে, "হ্যাঁ, মানিকবাবু, বিপদকে আমরা ভালবাসি। বিপদ না থাকলে মানুষের জীবনটা হয় আলুনি আলুভাতের মতন! সে-রকম জীবনকে আমরা ঘৃণা করি। বিপদকে আমরা ভালবাসি।"

মানিকবাবু বললেন, "আমি কিন্তু বিপদ-আপদ মোটেই পছন্দ করি না।"

কুমার হেসে বললে, "কিন্তু পছন্দ না করলেও বিপদ এসে আপনারই দরজায় অপেক্ষা করছে। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখুন, নিচে কারা দাঁড়িয়ে আছে!"

বিমল বললে, "অ্যাঁ! তারা এসেচে নাকি?"

কুমার বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু অন্ধকারে তাদের দেখাচ্ছে, আবছায়ার মত। বিশেষ কিছুই বোঝবার যো নেই।"

মানিকবাবু ধপাস করে একখানা চেয়ারের ওপরে বসে পড়লেন। বিমল জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বাইরে এত অন্ধকার যে, চোখ প্রায় চলে না। নিচে জমির ওপরে কারা চলা-ফেরা করছে —ঠিক যেন কতকগুলো ছায়া ন'ড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। একটা ছায়া খুব প্রকাণ্ড এবং অন্ধকারের চেয়েও কালো! কেবল সেই ছায়াটা চলা-ফেরা করছিল না। সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খালি দুলছে আর দুলছে। অন্ধকারের ভিতর থেকে তার দুটো চোখ দু-টুকরো কয়লার মতন জ্বলে উঠছে। সে চোখ কি মানুষের চোখ ?

হঠাৎ নিচ থেকে চাপা-গলায় কে বললে, "না, সে কাগজের মোড়কটা এখানে নেই।"

আর একজন বললে, "ভালো করে খুঁজে দ্যাখ।"

–"আর খোঁজা মিছে! সেটা নিশ্চয়ই কেউ কুড়িয়ে নিয়ে গেছে।"

—"নিয়ে আর যাবে কোথায় ? দেখছি আমাদের বাড়ির ভেতরে ঢুকতে হবে। ঘটোৎকচ!"

প্রকাণ্ড ছায়াটা দুলতে-দুলতে এগিয়ে এল।

—"ঘটোৎকচ ! আমাদের সঙ্গে আয় আবার আমাদের গাছে চড়তে হবে।"

বিমল ওপর থেকে চেঁচিয়ে বললে, "এস বন্ধুগণ, আমরাও তোমাদের আদর করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি।...কুমার, বন্দুকটা এগিয়ে দাও তো।"

এক মুহূর্তের ভিতরে মাঠের ওপর থেকে ছায়াগুলো স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করে সরে গেল।

বিমল মুখ ফিরিয়ে বললে, "মানিকবাবু, চাঙ্গা হয়ে উঠুন। ঘটোৎকচ আজ আর যুদ্ধ করবে না।"

এই কি ঘটোৎকচ?

ডেক-চেয়ারের ওপরে বসে এবং রেলিংএর ওপরে হাত ও মুখ রেখে মানিকবাবু অত্যন্ত ম্রিয়মানের মতন সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ।

কুমার তার কাঁধের ওপরে একখান হাত রেখে বললে, “মানিকবাবু, কী ভাবছেন?”

—“ভাবচি আমার মাথা আর মুণ্ডু, আকাশ আর পাতাল!”

—“ভেবেও কোন কুল-কিনারা পাচ্ছেন না বুঝি?”

—“কূল-কিনারা? অকূলে ভেসে কূল-কিনারা খুঁজে লাভ? আমি এখন মরিয়া হয়ে উঠেচি—একদম্ মরিয়া! এখন আমি মানুষ খুন করতে পারি।”

–“ভাল কথাই তো! তাহলে এখন আপনার আর কোন দুঃখ নেই তো?”

মানিকবাবু আবার কেমন মুষড়ে পড়লেন। কাঁচুমাচু মুখে বললেন, “ও বাবা, দুঃখ আবার নেই? কোথায় যাচ্ছি ভগবান জানেন; কাঁধের ওপরে মাথা নিয়ে আর কি কখনো দেশে ফিরতে পারব?”

এমন সময়ে বিমল, পুরাতন ভৃত্য রামহরি এবং তাদের পিছনে পিছনে বাঘা কুকুর সেখানে এসে হাজির হল ।

বিমল বললে, “মানিকবাবুর সঙ্গে কী কথা হচ্ছে কুমার?”

কুমার বললে, “দেশ ছেড়ে মানিকবাবুর বড় দুঃখ হয়েচে ।”

বিমল বললে, “তা তো হবেই কুমার! তাই হওয়াই তো উচিত। দেশ ছাড়তে যার মনে দুঃখ হয় না, আমি তাকে ঘৃণা করি। যে দেশের মাটি আমাকে শয়নের শয্যা পেতে দিয়েচে, ক্ষুধায় ফল-ফসল জুগিয়েচে, তেষ্টায় অমৃতের মতন মিষ্টি জল দান করেচে,যে দেশের বাতাস আমার নিঃশ্বাস হয়েচে, যে-দেশের আকাশ সূর্য-চাঁদের আলো জ্বেলে আমার চোখে দৃষ্টি দিয়েচে, সে-দেশকে ছাড়তে প্রাণ যে না কেঁদে পারে না! মানুষ-মায়ের চেয়েও যে এই দেশ-মা বড় মানুষ-মা

তো চিরদিন তার সন্তানকে লালন-পালন করতে পারেন না। কিন্তু দেশ-মা যে চিরদিন তার নিজের মাটি-কোলের ভিতরে ছেলে-মেয়েকে আদরে আগলে রেখে দেন -- তার মৃত্যু নেই, শ্রান্তি নেই, অযত্ন নেই। ঐ চেয়ে দেখ, আমাদের সোনার দেশ সোনার সূর্যের সোনার আলোয় ঝলমল করতে করতে এখনও আমাদের মুখের পানে কত স্নেহ, কত প্রেম নিয়ে তাকিয়ে আছেন।"

জাহাজ তখন আরব-সাগরের সুনীল বক্ষ ভেদ করে সশব্দে অগ্রসর হচ্ছিল। দূরে দেখা যাচ্ছে মা ভারতবর্ষের রৌদ্রধৌত বিপুল তটভূমি -- মাথার উপরে নির্মেঘ নীলাকাশের উজ্জ্বল চন্দ্রাতপ, বুকের উপরে শত উপবনের শ্রীমন্ত শ্যামলতসা আর সহস্র মন্দির-প্রাসাদের উচ্চ চূড়া এবং চরণের উপরে আরতিমত্ত মহাসমুদ্রের ফেনশুভ্র লক্ষ চঞ্চল বাহুর প্রণাম-আগ্রহ!

...ভারতবর্ষ। ভীমার্জুনের জন্মক্ষেত্র! আর্য-জাতির স্বদেশ! সকলে নীরবে সেই দিকে চেয়ে অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর রামহরি বলল, "দেশকে যদি অতই ভালবাস, তাহলে দেশ ছেড়ে আবার বিদেশে যাওয়া কেন বাপু? সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে বুঝি?"

বিমল হেসে বলল, "হ্যাঁ, রামহরি, ঠিক তাই। তুমি তো জানই আমাদের ঘাড়ে সর্বদাই একটা ভূত চেপে থাকে, যেই দুদণ্ড চুপ করে বসি, অমনি সেই ভূতটা এসে পিঠে কিল মারে, আর ভূতের কিল হজম করতে না পেরে আমরাও তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে পড়ি ।"

রামহরি রাগে গজগজ করতে-করতে বললে, "ঐ ভূতই একদিন তোমাদের ঘাড় মটকাবে!"

কুমার বললে, "আচ্ছা রামহরি, ময়নামতির মায়াকাননে তুমিই তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে, আর কখনো আমাদের সঙ্গে আসবে না। তবে এবারেও আবার এলে কেন?"

রামহরি বললে, "আসি কি আর সাধে রে বাপু? চিলে যখন চড়ুইয়ের ছানাকে ছোঁ মারে তখন চড়ুই-মা চিলের পিছনে ছুটে যায় কি সখ করে? তোমাদের সঙ্গে আসতে হয়, না এসে উপায় নেই বলে। এখনো আমার এই বুড়ো হাতে ঘুণ ধরে নি, এখনো চার পাঁচটা জোয়ান মরদের সঙ্গে খালি হাতে লড়তে পারি। আর আমি থাকতে তোমরা কেন বিদেশে বেঘোরে প্রাণ হারাবে, তাও কি কখনো হয়! আয়রে বাঘা, এখান থেকে চলে আয়, পাগলদের সঙ্গে বকাবকি করে লাভ নেই -- এই বলে বাঘাকে নিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু যেতে-যেতে হঠাৎ একদিকে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিমলকে বললে, "দেখ খোকাবাবু, জাহাজে উঠে পর্যন্ত দেখচি, ঐ বেয়াড়া-চেহারা লোকটা সব জায়গাতেই খালি আমাদের পিছনে পিছনে ঘুরচে।"

একটু তফাতেই একটা লোক বুকের উপরে দুই হাত রেখে রেলিঙে ঠ্যাসান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল এবং তার চেহারা কেবল বেয়াড়া নয়, ভয়ানকও বটে। লোকটা মাথায় অন্তত সাড়ে-ছয় ফুট উচু চওড়াতেও প্রকাণ্ড -- এমন লম্বা চওড়া লোক যে থাকতে পারে, না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সব-চেয়ে ভীষণ হচ্ছে তার মুখ! তার রং আবলুস কাঠের মতন কালো-কুচুকুচে ও তার চোখ দুটো আশ্চর্য-রকম জ্বলজ্বলে ও জন্তুর মতন হিংস্র। তার নাকটা বাঁদরের মতন থ্যাব্ড়া। আর মাংসহীন মড়ার মাথার দাঁতগুলো যেমন বেরিয়ে থাকে তারও দু-পাটি দাঁত তেমনিভাবে ছরকুটে বাইরে বেরিয়ে আছে - কারণ, তার ওপরের ও নিচের দুই ঠোঁটই না-জানি কোন দুর্ঘটনায় কেমন করে উড়ে গেছে। তার মাথায় লাল রঙের একটা তুর্কি ফেজ টুপি, পরনে খাঁকি কোর্তা ও প্যান্ট এবং হাতে এমন একগাছা লাঠি, যার এক ঘায়ে যে কোন মানুষের মাথা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে।

এ-রকম খাপ্ সুরৎ চেহারা রাতের বেলায় সুমুখে দেখলে রাম নাম জপ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না, দিনের বেলাতেই তাকে দেখে মানিকবাবু চক্ষু ছানাবড়া করে ভয়ে আঁৎকে উঠলেন।

বিমল অবাক হয়ে তার দিকে দুপা এগিয়ে যেতেই সে আস্তে আস্তে অন্যদিকে চলে গেল এবং যাবার সময়েও কুৎকুতে চোখের কোণ দিয়ে চোরাচাহনিতে বার-বার তাদের পানে তাকাতে লাগল।

তার চলার ধরন দেখে বিমলের দৃষ্টি তার পায়ের দিকে আকৃষ্ট হল। লোকটার ডান পায়ে মাত্র কড়ে আঙুল ছাড়া আর কোন আঙুল নেই!

কুমার বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "কে ও ? আর আমাদের পিছুই-বা নিয়েচে কেন?"

বিমল বললে, "ওর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, লোকটা জাতে কাফ্রি আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই আফ্রিকারই বাসিন্দা। ওর ফেজটুপি দেখে বোঝা যাচ্চে, লোকটা ধর্মে মুসলমান । ওর ভাবগতিক দেখে বোঝা যাচ্চে, লোকটা যেই-ই হোক, আমাদের বন্ধু নয়।"

কুমার বললে, "বন্ধু নয়! শত্রু? তবে কি বুঝতে হবে, শত্রুরাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এই জাহাজে চড়ে, আফ্রিকায় যাচ্চে ।

বিমল বললে, "আমার তো সেই সন্দেহ-ই হচ্চে।"

–"কিন্তু তারা কারা?"

–"কী করে বলব? রামু ছাড়া তাদের দলের আর কারুকে আমরা দেখি নি। রামু যদি জাহাজে উঠে থাকে, তবে নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে। অন্য কোন শত্রুকে আমরা চিনি না, আর এই কাফ্রিটা সত্য-সত্যই আমাদের শত্রু কিনা তাও ঠিক করে বলা যায় না। কিন্তু সন্দেহ যখন হচ্চে, তখন আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে।"

মানিকবাবু বললেন, "ও কাফ্রিটা যে কে, আমি বলতে পারি।"

বিমল সবিস্ময়ে বললে, “আপনি বলতে পারেন?”

–“হ্যাঁ। ঐ লোকটা হচ্ছে আপনার সেই ঘটোৎকচ!”

বিমল হাসতে-হাসতে বললে, “না মানিকবাবু, না। ঘটোৎকচের চেহারা এতটা ভদ্র হতে পারে না।”

মানিকবাবু বললেন, “ও বাবা, ঐ কাফ্রিটার চেহারা হল আপনার কাছে ভদ্র?”

বিমল মাথা নেড়ে বললে, “না, আমার কাছে নয় -- কিন্তু ঘটোৎকচের কাছে ওর চেহারা ভদ্র বৈকি! ঘটোৎকচকে সামনে দেখলে আপনি এখনি মূর্চ্ছা যেতেন।”

–“কী করে জানলেন আপনি?”

—“আমার কাছে প্রমাণ আছে। আর সে প্রমাণ আপনিই আমাকে দিয়েছিলেন।”

--“ও বাবা, সে আবার কী?”

–“হ্যাঁ। পরে সব জানতে পারবেন।"

ঘটোৎকচ গ্রেপ্তার

সেদিন বিকালে বিমল, কুমার ও রামহরি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে কথাবার্তা কইছিল। মানিকবাবু আজ কেবিন থেকে বাইরে বেরুতে পারেন নি। তিনি সামুদ্রিক-পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন – ক্রমাগত বমন করছেন।

চারিদিকে নীল জল থৈ-থৈ করছে -- অগাধ সমুদ্র যেন নিজের সীমা হারিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে গিলে ফেলে, আকাশের প্রান্তে ছুটে গিয়ে তাকেও ধরে টেনে পাতালে চুবিয়ে দিতে চাইছে। এবং সূর্য শূণ্য-পথে পশ্চিমে এগুতে-এগুতে মহাসাগরের অনন্ত বুক জুড়ে যেন লক্ষ-কোটি হীরের প্রদীপ জ্বালছে আর নেবাচ্ছে-- জ্বালছে আর নেবাচ্ছে! সে আলো-খেলার দিকে তাকালেও চোখ অন্ধ হয়ে যায়!

রামহরি বলছিল, "খোকাবাবু, তোমরা মিছে ভয় পেয়েছ। শত্রুরা আমাদের পিছু নিতে পারেনি। তাহলে এতদিনে নিশ্চয়ই আমরা টের পেতুম।"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। আমরা বোধ হয় তাদের ফাঁকি দিয়েছি।

কুমার বললে, "একটা বিপদ কমল বটে, কিন্তু আমাদের সামনে এখনো লক্ষ বিপদ আছে।...আচ্ছা বিমল, আমাদের সমুদ্রযাত্রা কবে শেষ হবে বলতে পারো? আর ভালো--"

কুমারের মুখের কথা ফুরুবার আগেই বিমল তাকে ও রামহরিকে এক-এক হাতে প্রচণ্ড এক-একটা ধাক্কা মেরে নিজেও বিদ্যুতের মতন সাঁৎ-করে এক পাশে সরে গেল। ধাক্কার বেগে সামলাতে না পেরে কুমার ও রামহরি দু-দিকে ঠিকরে পড়ে গেল এবং পড়তে-পড়তে শুনতে পেলে, তাদের পাশেই দমাস্ করে বিষম এক শব্দ আর ওপর থেকে হো-হো করে অট্টহাসির আওয়াজ!

দুজনে উঠে দেখে, তারা যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেইখানটায় মস্ত একটা পিপে পড়ে ভেঙে গেছে এবং তার ভিতর থেকে একরাশ লোহা-লক্কড় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে!

বিমল হাস্যমুখে বললে, "কুমার, ভাগ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম! নইলে এই লোহা বোঝাই পিপেটা মাথায় পড়লে আমাদের সমুদ্রযাত্রা আজকেই শেষ হয়ে যেত!"

কুমার বিবর্ণমুখে বললে, "কে এ কাজ করলে?"

—"ওপরের ডেক থেকে এই পিপেটা পড়েচে । সেই সময়েই পিপেটার দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায়। আমি আর কিছু দেখতে পাইনি--দেখবার সময়ও ছিল না। কিন্তু আমাদের বধ করবার জন্যেই যে এই পিপেটাকে ফেলা হয়েছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।"

রামহরি বললে, "আমি একটা বিচ্ছিরি হাসি শুনেছি।"

কুমার বললে, "আমিও শুনেছি। চল, ওপরে গিয়ে একবার খোঁজ করে আসা যাক। যদি তাকে পাই তাহলে এবারে সে নিশ্চয়ই আর হাসবে না।"

তিন জনে ওপর-ডেকে গেল। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। তখন জাহাজের কাপ্তেন-সাহেবকে ডেকে এনে বিমল সব কথা বললে ও ভাঙা পিপেটাকে দেখালে। কাপ্তেন জাহাজের কর্মচারী ও লস্করদের ডেকে আনিয়ে অনেক প্রশ্ন করলে, কিন্তু কেউ কোন সন্ধান দিতে পারলে না ।

পরের রাত্রে জাহাজ মোম্বাসায় পৌঁছবার আগের রাত্রেই আবার এক ঘটনা!

বিমলরা একটা গোটা কেবিন রিজার্ভ করে সবাই এক ঘরে থাকত ।

মানিকবাবু, কুমার ও রামহরি ঘুমিয়ে পড়বার পরেও বিমল একখানা বই নিয়ে জেগে রইল। তারপর রাত যখন একটা বাজল, তখন সে আলো নিভিয়ে

দিয়ে শুয়ে পড়ল। জাহাজের ওপরে আছড়ে সমুদ্রের জল কেঁদে উঠেছে; তাই শুনতে-শুনতে তার চোখ ঘুমে এলিয়ে এল ।

...হঠাৎ বাঘার গোঁ-গোঁ গর্জন তারপরই তার আর্তনাদ শুনে চট করে বিমলের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে বসতেই সে শুনলে, বাঘা আবার গর্জন করে উঠল--সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে তাদের কেবিনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল! আলোর চাবি টিপে বিমল দেখলে, বাঘা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে কেবিনের বন্ধ দরজার ওপরে বার-বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ততক্ষণে আর-সকলেও জেগে উঠল ।

বিমল বললে, “অন্ধকারে ঘরের ভিতর কে ঢুকেছিল, বাঘার সঙ্গে লড়াই করে সে আবার দরজা বন্ধ করে চম্পট দিয়েছে!”-- বলেই সে নিচে নেমে মেঝে থেকে কী তুলে নিলে! কুমার বললে, “কী ও?”

–“একরাশ লোম ।”

–“লোম!”

--“হ্যাঁ।” বিমল পকেটে হাত দিয়ে একটা কাগজের ছোট মোড়ক বার করে বললে, “মানিকবাবু দেখে যান!”

মানিকবাবু ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বিমল বললে, “মানিকবাবু, আপনি প্রথম যেদিন আমাদের বাড়িতে যান, সেই দিন এই কাগজের মোড়কটা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, মনে আছে?”

—“হ্যাঁ, ওর ভেতরে একথোকা লোম আছে । শত্রুরা আমার বাড়ি আক্রমণ করে চলে যাবার সময়ে আমার মরা-কুকুরের মুখে ঐ লোমগুলো লেগেছিল।”

—“আর কেবিনে যে ঢুকেছিল, তারও গা থেকে বাঘা কামড়ে লোমগুলো তুলে নিয়েছে। দেখুন এই লোম আর আপনার মোড়কের লোম এক কিনা!”

সকলে আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে দেখলে, সব লোমই এক-রকমের । মানিকবাবু ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। রামহরি তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল, তার কোথাও চোট্, লেগেছে কিনা!

কুমার বাঘার মাথা চাপড়ে বললে, "সাবাস বাঘা! মানিকবাবুর কুকুর যুদ্ধে মারা পড়েছিল, তুই কিন্তু লড়াই ফতে করেছিস্! আমাদের বাঘা কি যে-সে জীব, জলে-স্থলে-শূণ্যে সর্বত্র সে জয়ী হয়েছে।"

এমন সময়ে বাইরে গোলমাল শোনা গেল--চারিদিকে যেন অনেক লোকজন ছুটাছুটি করছে। বিমল, কুমার ও রামহরি তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল। মানিকবাবু কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে হতাশভাবে বসে পড়ে বললেন, "প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারব না দেখছি?"

ডেকের ওপরে লোকারণ্য। কাপ্তেন-সাহেব দাঁড়িয়ে আছে এবং নিচে দুহাতে ভর দিয়ে বসে একজন পূর্ব্ববঙ্গীয় লস্কর ক্ষীণস্বরে বলছে, "না, না, আমি ভুল দেখি নি! ভূত, একটা ভূত আমাকে মেরেছে!"

একে-তাকে জিজ্ঞাসা করে বিমল ব্যাপারটা সব শুনলে । খানিক আগে ঐ লস্করটা এদিক দিয়ে যাচ্ছিল । চাঁদের আলোয় হঠাৎ সে দেখতে পায় কে যেন চোরের মত লুকিয়ে-লুকিয়ে তার সামনে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। লস্করটা তাকে ধরতে যায়, অমনি সেও তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে। লস্কর বলছে, মানুষের মতন তার হাত-পা আছে বটে, কিন্তু সে মানুষ নয়, ভূত! কাপ্তেন তার কথায় বিশ্বাস করছে না।

ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে বিমল কাপ্তেনের কাছে সেই অজ্ঞাত শত্রুর সঙ্গে বাঘার যুদ্ধের কথা খুলে বললে। কাপ্তেন বিস্মিত-স্বরে বললে, "তুমি বলতে চাও, যে তোমাদের কেবিনে ঢুকেছিল তার গায়ে লোম আছে?"

—"হ্যাঁ, এই দেখ।" বিমল মোড়কটা কাপ্তেনের সামনে খুলে ধরল। কাপ্তেন হতভম্বের মতন মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললে, "জানি না, এ কী ব্যাপার! ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।"

কে একজন অস্ফুটকণ্ঠে হেসে উঠল। বিমল চমকে মুখ তুলে দেখলে, ভিড়ের ভিতরে সকলের মাথার ওপরে মাথা তুলে সেই সাড়ে-ছয়-ফুট উঁচু লম্বা-চওড়া কাফ্রিটা ওষ্ঠহীন মড়ার মতন দাঁত বার-করা ভয়ানক মুখে হাসছে, কি যে হাসছে, না ভয় দেখাচ্ছে?

* * *

পরদিন জাহাজ ইস্ট আফ্রিকার মোম্বাসা-বন্দরে এসে থামল । সঙ্গে সঙ্গে অগণিত ছোট নৌকা এসে পঙ্গপালের মতন জাহাজখানিকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে; এবং তাদের ওপরে বসে সোয়াহিলি জাতের মাঝি-মাল্লারা দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে, নানারকম ভঙ্গিতে হাত নেড়ে আপন আপন নৌকায় আসবার জন্যে যাত্রীদের ডাকতে লাগল।

বিমল, কুমার, মানিকবাবু ও রামহরি নিজেদের মালপত্তর ডেকের ওপরে এনে রাখছে, এমন সময়ে বিমল হঠাৎ দেখলে, সেই মড়াদেঁতো ঢ্যাঙা কাফ্রিটা ও তার আরো দুজন স্বদেশি লোক একটা মস্ত সিন্দুক ধরাধরি করে বাইরে বয়ে নিয়ে এবং সেটাকে খুব সাবধানে ডেকের ওপরে নামিয়ে রেখে আবার কেবিনের দিকে গেল--খুব সম্ভব, অন্যান্য মোট বাইরে আনবার জন্যে।

সিন্দুকের আকার দেখে বিমলের মনে কেমন সন্দেহ হল। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকটা পরখ করতে লাগল। সিন্দুকটা কাঠের । বিমল টেনে দেখলে, ডালা বন্ধ। তারপর ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ-দৃষ্টিতে দেখলে, সিন্দুকের ওপরে গায়ে সর্বত্রই অগুন্তি লোম লেগে রয়েছে! মোড়কটা আবার বার করে সিন্দুকের লোমের সঙ্গে মিলিয়ে সে বুঝলে, এ সবই অজ্ঞাত শত্রুর গায়ের লোম কিন্তু তার লোম এই সিন্দুকের গায়ে কেন? এই লম্বা চওড়া সিন্দুক, এর মধ্যেই অনায়াসেই

একজন মানুষের ঠাঁই হতে পারে! তবে কি কাফ্রিরা তখনো আসে নি। বিমল তাড়াতাড়ি নিজেদের দলের কাছে এসে দাঁড়াল, তারপর বললে, "মানিকবাবু, কুমার আমি এক অপূর্ব আবিষ্কার করেচি!"

–"কী, কী?"

—"ঘটোৎকচ! ঘটোৎকচ ঐ সিন্দুকের ভেতর লুকিয়ে আছে।" মানিকবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, "অ্যাঁ?"

—"চুপ? গোল করবেন না। চললুম আমি কাপ্তেনের কাছে।"

—"আজ ঘটোৎকচ গ্রেপ্তার হবে।"--বিমল তীরবেগে কাপ্তেনের খোঁজে ছুটল।

মানিকবাবু দুই চোখ কপালে তুলে বললেন, "ও বাবা! আরব্য উপন্যাসের দৈত্য বেরিয়েছিল কলসির ভেতর থেকে। আর আজ এই সিন্দুকের ভেতর থেকে বেরুবে, ঘটোৎকচ? এখন আমার উপায়? ...ও কুমারবাবু, আমাকে এখানে একলা ফেলে আপনিও বিমলবাবুর সঙ্গে কোথায় চললেন ? ও রামহরি! তুমিও যাও যে! বাঘা বাঘা! আরে, বাঘাও নেই। ঐ সিন্দুকে ঘটোৎকচ, আর আমি এখানে একা। যদি সে ফস্ করে সিন্দুক থেকে বেরিয়ে পড়ে? ও বাবা!"—মানিকবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ভয়ে ভয়ে দুই চোখ মুদে ফেললেন।

সিন্দুকের রহস্য

বিমল জাহাজের ডেকের ওপর খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করেও কাপ্তেনের দেখা পেলে না; তারপর খবর পেলে, কি কাজের জন্যে কাপ্তেন জাহাজের ইঞ্জিন-ঘরে গিয়েছে।

সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল। কাপ্তেন ইঞ্জিন-ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, এমন সময়ে বিমল তাকে গিয়ে ধরলে ।

বিমলকে অমন হন্ত-দন্ত হয়ে আসতে দেখে কাপ্তেন বললে, "ব্যাপার কী?"

বিমল খুব সংক্ষেপে সব কথা খুলে বললে। কাপ্তেন এক লাফ মেরে ইংরেজিতে একটা শপথ করে বললে, "অ্যাঁ, বল কী? সিন্দুকের ভেতর শত্রু! সে মানুষ না, ভূত?"

বিমল বললে, "সেটা এখনি জানতে পারা যাবে। সায়েব, তোমার লোকজনদের ডাকো-" বলেই পিছন ফিরে কুমার আর রামহরিকে দেখে বলে উঠলে, "একি, তোমরাও এখানে এসেচ কেন? যাও যাও, সেখানে পাহারা দাও গে। ছি ছি, তোমাদের কি বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই নেই?"

কুমার আর রামহরি অপ্রস্তুত হয়ে আগে আগে ছুটল, কাপ্তেনও চেঁচিয়ে লোকজনদের ডাকতে-ডাকতে তাদের পিছনে পিছনে চলল!

কাপ্তেনের হাঁক-ডাক শুনে অনেক লোক এসে জুটল। তারপর দলে খুব ভারি হয়ে সবাই যখন যথাস্থানে গিয়ে হাজির হল, তখন সিন্দুকও দেখা গেল না, কাফ্রি তিনজনও অদৃশ্য!

বিমল হতাশভাবে বললে, "ঘটোৎকচ আবার আমাদের কলা দেখালে! কুমার, রামহরি, তোমাদের বোকামিতেই এবারে সে পালাতে পারলে!"

কুমার দোষীর মতন সঙ্কুচিত-স্বরে বললে, “আমাদের দোষ আমরা মানচি। কিন্তু মানিকবাবু কোথায় গেলেন? তিনি তো এইখানেই ছিলেন।”

বিমল বললে, “তাইতো! মানিকবাবু কোন বিপদে পড়লেন না তো? মানিকবাবু, মানিকবাবু!”

ডেকের ওপরে একটা মস্ত কেঠো বা কাঠের বালতি উপুড় হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ সেটা নড়ে উঠল। কাঠের বালতিকে জীবনলাভ করতে দেখে বাঘা ভয়ানক অবাক হয়ে গেল এবং বালতির চারিদিক সাবধানে শুকে চিৎকার শুরু করে দিলে।

বালতির একপাশ একটু উঁচু হল এবং ফাঁক দিয়ে আওয়াজ এল, “ও বিমলবাবু, আপনাদের বাঘাকে সাম্‌লান, দম বন্ধ হয়ে আমি হাঁপিয়ে মারা যেতে বসেচি যে!”

বাঘা বালতির ফাঁকে নাক ঢুকিয়ে দিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললে, “গরর্‌র্‌র্‌, গরর্‌র্‌র্‌।” ফাঁকটা আবার বন্ধ হয়ে গেল ।

কুমার বাঘার কান ধরে টেনে আনলে, বিমল কেঠোটা টেনে তুলে ধরলে এবং ভিতর থেকে হাপরের মতন হাঁপাতে হাঁপাতে গলদঘর্ম মানিকবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

কুমার বললে, “মানিকবাবু, ওর মধ্যে ঢুকে কি করছিলেন?”

মানিকবাবু গায়ের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন, “প্রাণ বাঁচাচ্ছিলুম মশাই, প্রাণ বাঁচাচ্ছিলুম! বাইরে থাকলে ঘটোৎকচ কি আর আমাকে ছেড়ে কথা কইত?”

কাপ্তেন-সায়েব এতক্ষণ রেলিঙের ধারে দাড়িয়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে কি দেখছিল, হঠাৎ দূরবীন নামিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, “পেয়েচি পেয়েচি,—তাদের দেখা পেয়েচি!” বিমল ও কুমার একদৌড়ে কাপ্তেনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কাপ্তেন একদিকে আঙুল তুলে দেখালে, একখানা নৌকা তীরের দিকে বয়ে চলেছে, তার ওপরে মাঝি-মাল্লার সঙ্গে তিনজন কাফ্রি আর সেই সিন্দুকটা রয়েছে!

কাপ্তেনের হুকুমে তখনি জাহাজের দুখানা বোট নামিয়ে জলে ভাসানো হল এবং কয়েকজন খালাসী, জাহাজী গোরার সঙ্গে কাপ্তেন, বিমল ও কুমার গিয়ে সেই বোটের উপর চড়ে বসল। বোট বেগে এগুতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে বিমল বললে, "ঐ সেই ঠোঁটকাটা ঢ্যাঙা কাফ্রিটা সিন্দুকের ওপরে। ওরা বুঝতে পেরেচে যে, আমরা ওদেরই পিছনে যাচ্চি।"

কুমার বললে, "কিন্তু ওদের ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে না যে, আমাদের দেখে ওরা কিছু ভয় পেয়েছে।"

কাপ্তেন তার রিভলভারটা নাড়তে নাড়তে বললে, "ঐ ঢ্যাঙা কাফ্রিটাকে দেখলেই আমার রাগ হয়। ওদের অপরাধের প্রমাণ পেলে কারুকে আমি ছাড়ব না। সব পুলিশের কাছে চালান করে দেব!"

জাহাজের বোট দুখানা কাফ্রিদের নৌকার খুব কাছে গিয়ে পড়ল। একটা কাফ্রি সেই মড়া-দেঁতো কাফ্রির কানের কাছে মুখ এনে কি বললে। কিন্তু মড়া দেঁতো কোন জবাব দিলে না, বিশাল বুকের ওপরে দুখানা বিপুল বাহু রেখে কালো ব্রোঞ্জের মূর্তির মতন স্থিরভাবে সিন্দুকের ওপরে বসে রইল।

বিমলের গা টিপে কুমার বললে, "বিমল, দেখ, দেখ!"

_"কী?"

—"ঐ যে আর একখানা নৌকা যাচ্ছে, তার ওপরে তিনজন লোক,– ঠিক যেন বাঙালির মতন দেখতে ।"

বিমল অল্পক্ষণ তাদের দেখে কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঐ নৌকার লোকগুলোও কি আমাদের জাহাজে ছিল?"

কাপ্তেন দূরবীণ কষে ভালো করে তাদের দেখে বললে, “হ্যাঁ, ওরাও বাঙালি।”

—“কিন্তু জাহাজে তো ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি!”

—“না হওয়ারই কথা। ওদের ব্যবহার কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হত । ওরা কেবিনের বাইরে বড়-একটা আসত না, কারো সাথে মেলামেশা করত না। ওরা নাকি ইষ্ট আফ্রিকায় ব্যবসা করতে যাচ্ছে ...হ্যাঁ, আর—একটা কথা মনে হচ্ছে বটে! একদিন ঐ ঢ্যাঙা কাফ্রি-শয়তানটাকে ওদের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলুম!”

বিমল মৃদুস্বরে বললে, “কুমার, আমার বিশ্বাস ঐ বাঙালি তিনজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন আমাদের মানিকবাবুর গুণধর ছোট কাকা । মানিকবাবু আমাদের সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই ওকে চিনতে পারতেন!”

কুমার বললে,“আমরা কিন্তু ভবিষ্যতে ওকে দেখলে আর চিনতে পারব না--এত দূর থেকে ভালো করে নজরই চলচে না! দেখ--দেখ, ওরা নৌকার বেগ বাড়িয়ে দিলে! ওরা বুঝতে পেরেছে যে, আমরা ওদের লক্ষ্য করচি!”

কিন্তু আর সেদিকে দৃষ্টি রাখবার অবকাশ ছিল না, কারণ জাহাজের বোট দুখানা তখন কাফ্রিদের নৌকার দুপাশে এসে পড়েছে!

কাপ্তেন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, “এই! নৌকা থামাও!”

কাফ্রিদের নৌকা থেমে গেল। কাপ্তেন, বিমল ও কুমার এক এক লাফে নৌকার উপরে গিয়ে উঠল, কাফ্রিদের কেউ কোন আপত্তি করলে না!

মড়া-দেঁতো তেমনি অটলভাবেই সিন্দুকের ওপরে বসেছিল। কাপ্তেন হুকুম দিলে, “তুমি উঠে দাঁড়াও।”

মড়া-দেঁতোর চোখ বাঘের চোখের মত জ্বলজ্বল করে উঠল কিন্তু পরমুহূর্তেই কাপ্তেনের হাতে চকচকে রিভলভার দেখে তার জ্বল জ্বলে চোখের আগুন নিভে গেল। যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই সে সিন্দুকের ওপর থেকে উঠে দাঁড়াল।

কাপ্তেন একটানে সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেলে মহা-আগ্রহে তার ভিতরটা দেখতে লাগল, তারপর হতাশভাবে বিমলের দিকে মুখ ফেরালে।

বিমল হেঁট হয়ে দেখলে, সিন্দুকের ভিতরে কেউ নেই।

কাপ্তেন বললে, “কিন্তু সিন্দুকের ভিতরে এত লোম কেন ? এ কিসের লোম ? এর ভিতরে কি ছিল ?”

মড়া-দেঁতো কোন জবাব দিলে না। মুখটা একবার খিঁচিয়ে নৌকার এক কোণে গিয়ে বসে পড়ল।

কাপ্তেন বিমলের দিকে ফিরে বললে, “তোমার মোড়কে যে লোমগুলি দেখেছিলুম, এগুলোও ঠিক সেই রকম দেখতে। এ সিংহ, বাঘ, ভালুক, জেব্রা, হরিণ কি বানরের গায়ের লোম নয়। তবে এ কোন জীবের লোম?”

বিমল কি জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কি ভেবে চুপ মেরে গেল।

কাপ্তেন হতাশকণ্ঠে বললে, “রহস্যের কোন কিনারা হল না। এই কাফ্রি-শয়তানরা আগেই সাবধান হয়ে সিন্দুকে যে ছিল তাকে সরিয়ে ফেলেচে । চল, আর এখানে থেকে লাভ নেই!’

কুমার চারিদিকে চেয়ে দেখল, কিন্তু যে-নৌকায় তিনজন বাঙালি ছিল তাদের আর কোথাও দেখতে পেলে না।

ঘটোৎকচের উৎকোচ লাভ

আফ্রিকার পূর্বদিকে, ভারত-সাগরের মধ্যে মোম্বাসা হচ্ছে একটি ছোট দ্বীপ। তার বাসিন্দার সংখ্যা চল্লিশ হাজার। হাতির দাঁত, চামড়া ও রবারের ব্যবসার জন্যে এ দ্বীপে অনেক লোক আনাগোনা করে ।

এই দ্বীপটি ইতিহাসে অনেক দিন থেকেই বিখ্যাত । ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ নাবিক ভাস্কো ডা গামা এখানে এসেছিলেন। সেই সময়ে একজন আরবি, জাহাজ-শুদ্ধ তাকে ডুবিয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করে। ভাস্কো ডা গামা কোন গতিকে সেটা জানতে পেরে মহাখাপ্পা হয়ে মোম্বাসা শহরকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে উদ্যত হন, কিন্তু স্থানীয় সুলতান পায়ে-হাতে ধরে তাকে ঠাণ্ডা করেন। মোম্বাসার প্রধান রাজপথ ভাস্কো ডা গামা স্ট্রিট আজও এই অমর নাবিকের স্মৃতি বহন করছে।

মোম্বাসা শহর প্রতিষ্ঠা হয় প্রায় হাজার বছর আগে। কিন্তু এ শহরটি যে আরো পুরোনো, এখানে আবিষ্কৃত প্রাচীন চীন, মিশর ও পারস্য দেশের অনেক জিনিস দেখে তা বোঝা যায়। ১৫০৫ থেকে ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দ্বীপটি ছিল পর্তুগিজদের অধিকারে। আরবদের সঙ্গে পর্তুগিজদের কয়েকবার যুদ্ধবিগ্রহও হয়ে গেছে। ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মার্চ মাস থেকে সুদীর্ঘ তিন বছর তিন মাস ধরে পর্তুগিজরা আরবদের দ্বারা এই দ্বীপে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। পর্তুগাল থেকে সাহায্য পাবার আশায় অবরুদ্ধ পর্তুগিজরা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু তাদের আশা সফল হয় না। আরবদের তরবারির মুখে শেষটা পর্তুগীজদের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ যায় এবং নিয়তির এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে, সেই হত্যাকাণ্ডের ঠিক দুদিন পরেই পর্তুগাল থেকে সাহায্য এসে উপস্থিত হয়।

কিছুদিন পরে মোম্বাসা আবার পর্তুগিজদের হাতে যায় বটে, কিন্তু তাদের সে প্রাধান্য স্থায়ী হয় না। মোম্বাসা এখন জাঞ্জিবারের সুলতানের অধীনে। এবং

দ্বীপের যিশু কেল্লা আজও প্রাচীন পর্তুগিজ প্রাধান্যের নিদর্শনের মত দাঁড়িয়ে আছে।

মোম্বাসা শহরটি বেশ । আফ্রিকার বিশাল বুকের ভিতর যে গভীর জঙ্গল দুরারোহ পর্বতমালা ও বিজন মরুভূমি লুকিয়ে আছে, মোম্বাসাকে দেখলে তা মনে হয় না। এই শহরটিতে আধুনিক সভ্যতার কোন চিহ্নেরই অভাব নেই। বাষ্পীয়-পোত, মটর গাড়ি, রেলগাড়ি, দোতলা-তেতালা বাড়ি ও বড়-বড় হোটেল সবই দেখা যায়। বাসিন্দাদের ভিতরে আরবদের সংখ্যাই বেশি হলেও অন্যান্য অনেক জাতীয়-এমন কি, ভারতীয় লোকের সঙ্গে ও পথে-ঘাটে সাক্ষাৎ হয় । রাজপথের প্রধান গাড়ি হচ্ছে একরকম ট্রলি, সরু রেল-লাইনের উপর দিয়ে আনাগোনা করে এবং তাকে ঠেলে নিয়ে যায় সোয়াহিলি জাতের দুজন করে কুলি।

শহরের বাইরেই সুন্দর সবুজ বন । সে বনে বাওবাব্ (আর এক নাম, বাদুরে-রুটিগাছ) কলা, আম, খেজুর ও নারিকেল প্রভৃতি নানা গাছ চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়। উজ্জ্বল রোদের সোনার জল দিয়ে ধোয়া মোম্বাসা নগরী যখন নিস্তরঙ্গ ভারত-সাগরের স্থির নীলদর্পণে নিজেই নিজের ছায়া দেখতে পায়, তখন তার কী শোভাই যে হয় তা আর বলবার নয়।

হোটেলের বারান্দায় বসে বিমল, কুমার ও মানিকবাবু চুপি-চুপি কথা কইছিলেন। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রামহরি চা তৈরি করছে এবং তার সামনে বসে বাঘা মুখ উঁচু করে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়ছে - একটু-আধটু চিনি বা দু-এক টুকরো রুটি বখশিস পাবার লোভে।

মানিকবাবু বললেন, “তাহলে এখান থেকে আমাদের যেতে হবে উজিজিতে?”

কুমার বললে, “হুঁ, বুড়ো সর্দার গাটুলার খোঁজে।”

—“যদি সে মরে গিয়ে থাকে, কি তার দেখা না পাই, তাহলে আমরা কি করব?”

বিমল বললে, “সে কথা নিয়ে এখনো মাথা ঘামাইনি ... আচ্ছা কুমার, আমার সঙ্গে যাবার জন্যে তুমি কত লোক ঠিক করেছ?”

–“ঠিক একশো চব্বিশ জন ।”

–“তাদের জন্যে মাসে কত খরচ পড়বে?”

—“প্রায় সাতশো টাকা ।”

—"আস্কারি নিয়েচ কজন?”

—“চব্বিশ জন ।”

মানিকবাবু সুধোলেন, "আস্কারি কী?”

—“সশস্ত্র কুলি।”

—“ও বাবা! অত অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে কী হবে? আমাদের যুদ্ধ করতে হবে নাকি?”

বিমল গম্ভীরভাবে বললে, “হতে পারে।”

রামহরি চা দিয়ে গেল। সকলে নীরবে চা পান করতে লাগল।

কুমার বললে, “আচ্ছা বিমল, মানিকবাবুর মেজো কাকা যে ম্যাপ দিয়েছেন, সেখানা তুমি কোথায় রেখেচ?”

বিমল অকারণে কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বললে, “ম্যাপখানা আমার কোটের ভিতরকার পকেটে আছে।”

কুমার বললে, “আঃ, অত চেঁচিয়ে কথা কইচ কেন, কেউ যদি শুনতে পায়!”

—“তার মানে?”

—“আমাদের পিছনে ঐ যে থামটা রয়েছে, ওর আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন লোক এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিল।"

সভয়ে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বিমলের কাছে সরে এসে মানিকবাবু বললেন, “ও বাবা! বলেন কি মশাই? আপনি কি করে জানলেন?”

—“আমার সামনে টেবিলের ওপরে এই যে আর্শিখানা আছে, এর ভেতর দিয়েই সেই লোকটার ওপরে আমি নজর রেখেছিলুম।”

–“কে সে?”

—“বোধ হয় সে বাঙালি!”

—“অ্যাঁ! বাঙালি!"

–“হ্যাঁ, ঐ দেখুন মানিকবাবু, হোটেল থেকে বেরিয়ে সে রাস্তায় গিয়ে পড়েচে!” বলেই বিমল পকেট থেকে একটা ছোট দূরবীণ বার করে লোকটাকে দেখতে লাগল।

মানিকবাবু হঠাৎ একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে, বারান্দার ধারে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, “ছোটকাকা। অ ছোটকাকা! ছোট কাকা!”

লোকটা যেন শুনতেই পেলে না, আপন মনে এগিয়ে গিয়ে একখানা চলন্ত ট্রলি গাড়িতে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল!

চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে বিমল ধীরে ধীরে বললে, “উনিই আপনার ছোট কাকা? ওঁরই নাম মাখনবাবু?”

—“হ্যাঁ। কিন্তু কী আশ্চর্য! আমি এত চেঁচিয়ে ডাকলুম, তবু উনি শুনতে পেলেন না ।”

—“মাখনবাবু আপনার ডাক শুনতে রাজি নন।”

–“রাজি নন! কেন?”

—“কেন? তাও বুঝতে পারচেন না? উনিই যে ঘটোৎকচের প্রভু!”

অতিরিক্ত বিস্ময়ে মানিকবাবু অবাক হয়ে বিমলের মুখের দিকে মূঢ়ের মতন তাকিয়ে রইলেন ।

বিমল দুলতে দুলতে বললে, “আমার মনের ক্যামেরায় আমি মাখনবাবুর ফটোগ্রাফ তুলে নিয়েচি। ওর মুখ আর ভুলব না।”

কুমার বললে, “বিমল, মাখনবাবু টের পেয়েছেন, ম্যাপখানা কোথায় আছে। ম্যাপখানা তুমি অন্য কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখো।"

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বিমল ফিরে বললে, “রামহরি, আজ রাত্রে তুমি বাঘাকে ভেতর থেকে বার করে দিও।”

* * *

অনেক রাত্রে বিমলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার ।

সেই অন্ধকারের ভিতরে খুস খুস করে শব্দ হচ্ছে-যেন কে আস্তে আস্তে চলে বেড়াচ্ছে ।

বিমলের মনে হল যেন তার মুখের উপর কার গরম নিঃশ্বাস এসে পড়ল। সে অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইল, রিভলভারটা জোরে চেপে ধরে।

পায়ের দিকে একটা খোলা জান্‌লা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। আকাশের বুকে চাঁদের মুখ নেই,—খালি হাজার হাজার তারা মিট্ মিট্ করে জ্বলছে, স্থির জোনাকির মতো ।

হঠাৎ জানলার আকাশ অদৃশ্য হয়ে গেল-একটা চলন্ত অন্ধকার এগিয়ে এসে যেন জানলার ফাঁকাটা একেবারে বুঁজিয়ে দিলে।

আচম্বিতে অন্ধকার অদৃশ্য হল এবং তারা ভরা আকাশ আবার দেখা যেতে লাগল । বিমলও শান্তভাবে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল বেলায় চোখ মেলেই কুমার দেখলে, বিমল একটা জান্‌লার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কুমার বললে, “ওখানে কী করচ?”

–"ঘটোৎকচ কোন স্মরণ-চিহ্ন রেখে গেছে কীনা দেখছি।

কুমার ধড়মড় করে উঠে বসে বললে, "তার মানে?"

–"এই জানলার গরাদ ভেঙে কাল রাতে ঘটোৎকচ ঘরের ভেতরে এসেছিল।"

–"ম্যাপ, ম্যাপ, তোমার পকেটে ম্যাপখানা আছে তো?"

--"না।"

--"সর্বনাশ!"

--"ঘটোৎকচ ম্যাপখানা নিয়ে লম্বা দিয়েচে । আমার হাতে রিভলভার ছিল, ইচ্ছা । করলেই আমি তাকে গুলি করতে পারতুম, কিন্তু আমি তা করি নি। আমি তাকে পালাতে দিয়েচি।"

–"বিমল, "তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?"

—"শোনো? ম্যাপখানা কোথায় আছে, সে খোঁজ কাল বিকালে আমি শত্রু পক্ষকে দিয়েছিলাম। শত্রু যে আসবে সেটা আমি আগে থেকেই জানতাম। ধরতে গেলে, ঘটোৎকচকে আমি একরকম নিমন্ত্রণ করেই এখানে আনিয়েছিলুম। বাঘাকে পর্যন্ত ঘরের ভেতরে রাখি নি, পাছে সে ঘটোৎকচকে পছন্দ না করে।"

—"বিমল, তোমার কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারচি না!"

বিমল জানলার কাছ থেকে সরে এসে বললে, "কুমার, ঘটোৎকচ যে ম্যাপখানা নিয়ে গেছে, সেখানা হচ্ছে নকল। আসল ম্যাপ আমার কাছে।"

কুমার আনন্দে এক লাফ মেরে বলে উঠল, "ওহো বুঝেচি-বুঝেচি!"

বিমল বললে, "ঐ নকল ম্যাপ দেখে এ গুপ্তধন আনতে যাবে তাকে ভুল পথে ঘুরে ঘুরে মরতে হবে। নকল ম্যাপখানা অনেক কষ্টে আমি তৈরি করেচি।"

ভীষণ অরণ্যে

আসল পথ-চলা শুরু হয়েছে। সকলে দল বেঁধে চলেছে, কখনো বনের ভিতরে, কখনো পাহাড়ের কোলে, কখনো নদীর ধারে, কখনো মাঠের উপরে মাঝে-মাঝে একএকখানা নোংরা গ্রাম, তার কুঁড়েঘরগুলো যেমন নড়বড়ে আর ভাঙাচোরা, তার বাসিন্দারাও তেমনি গরিব ও শ্রীহীন। মাঝে মাঝে ধান ও আখ প্রভৃতির ক্ষেতও চোখে পড়ে। অনেক জায়গা দেখেই ভারতবর্ষকে মনে পড়ে।

পথে যেতে-যেতে কতরকম জানোয়ারই দেখা যায়! কোথাও উঠপাখির দল ঢ্যাঙাঢ্যাঙ পা ফেলে ছুটোছুটি করছে, কোথাও একদল জেব্রা মানুষ দেখেই দৌড় দিচ্ছে, কোথাও বেঢপ জিরাফ তার অদ্ভুত গলা বাড়িয়ে গাছের আগডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে , তারপর মানুষের সাড়া পেয়েই ছুটে পালাচ্ছে !...এই জিরাফদের ছুটে পালাবার ভঙ্গি এমন বেয়াড়া যে, দেখলে গোমড়া-মুখো প্যাঁচারা পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারবে না। এখানে গাছের উপর ব'সে বেবুন-বাঁদরের দল মানুষকে মুখ ভ্যাংচায়,নদীর জলে হিপোপটেমাসের দল সাঁতার কাটে ও বড় বড় কুমীরের দল কিলবিল করে এবং মানুষের দিকে মুখ তুলে যেন বলতে চায়- তোমরা দয়া করে একবার জলে নামো,আমাদের বড্ড খিদে পেয়েছে এখানে পায়ের তলায় ঘাসের মধ্যে থেকে সাপ ফোঁস করে ওঠে,রাত্রিবেলায় হায়েনারা চারিদিকে হা-হা করে হাসে, চিতাবাঘেরা তাঁবুর ভিতরেও বেড়াতে আসে এবং সিংহের দল কাছ ও দূর থেকে মেঘের ডাকের মতন এমন গম্ভীর গর্জন করে যে, অন্ধকার অরণ্য যেন শিউরে ওঠে এবং পৃথিবীর মাটি যেন থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে থাকে।

মানিকবাবুর অশান্তির আর সীমা নেই! তার মতে এখানকার প্রত্যেক ঝোপই হচ্ছে কোন-না-কোন ভয়ঙ্কর জানোয়ারের বৈঠকখানা এবং প্রত্যেক গাছই হচ্ছে ভূত-প্রেতের আড্ডা! সন্ধ্যা হলেই তিনি রাম-নাম জপ করতে আরম্ভ করেন

এবং পাছে কোন বদমেজাজি জন্তুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়, সেই ভয়ে তাঁবুর ভিতর থেকে একবারও বাইরে উঁকি মারেন না ।

মাঝে-মাঝে কাতরমুখে বলেন, “বিমলবাবু, আমি তো আপনাদের কাছে কোন দোষই করি নি, তবে দেশ থেকে এখানে টেনে এনে কেন আপনারা আমাকে অপঘাতে মারতে চান?"

বিমল বললে, “মানিকবাবু, জানেন তো, কাপুরুষ মরে দিনে একশো বার করে, কিন্তু সাহসী মরে জীবনে একবার মাত্র।”

মানিকবাবু বললেন, “সাহসেরও একটা সীমা আছে তো? মরণকে যখন সামনে পিছনে ডাইনে বায়ে অষ্টপ্রহর দেখতে পাচ্ছি তখন ভয় না পেয়ে কী করি বলুন তো?”

–“মরণকে নিয়ে খেলা করুন, মরণকে দেখলে তাহলে আর ভয় পাবেন না!”

–“পাগলের সঙ্গে কথা কয়েও চলে যান।”

সেদিন বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একটা কাফ্রিজাতীয় স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেল। তার দেহের নিচের অংশ নেই, উপর অংশও ভীষণরূপে বিক্ষত এবং তার মরা চোখদুটো ফ্যালফ্যাল করে আকাশের পানে তাকিয়ে আছে!

সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখেই মানিকবাবু ‘আঁ’ বলে আঁৎকে উঠে উন্মত্তের মতন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বনের ভিতরে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

কুমার মৃতদেহের দিকে চেয়ে বললে, “সিংহের কীর্তি।”

বিমল বললে, “হু। সিংহটা বোধহয় আমাদের সাড়া পেয়ে শিকার ছেড়ে বনের ভেতর গিয়ে লুকিয়েচে।"

রামহরি বললে, “কিন্তু মানিকবাবু যে ঐ বনের ভেতরেই গিয়ে ঢুকলেন!

—“ওকে ডেকে নিয়ে এস রামহরি, নইলে বিপদ।”

বিমল মুখের কথা শেষ হবার আগেই শোনা গেল, বনের ভিতর থেকে মানিকবাবু চিৎকার করে বলছেন, "গেলুম, গেলুম -- বাঁচাও আমাকে বাঁচাও।

বিমল, কুমার, রামহরি ও আস্কারি বা সশস্ত্র কুলির দল তখনই বনের ভিতরে ছুটে গেল এবং খানিক পরেই যে দৃশ্য দেখা গেল এই - মানিকবাবু একটা গাছের মাঝ -বরাবর উঠে প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছেন এবং ঠিক তাঁর মাথার উপর একটা ডালে বসে একটা বেবুন বাঁদর মুখ খিচিয়ে তাঁকে অনবরত ধমক দিচ্ছে এবং নীচে দাঁড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার গাছের গুড়ির উপরে বারবার খড়গাঘাত করছে। মানিকবাবুর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় - তিনি না পারছেন উপরে উঠতে, না পারছেন নিচে নামতে ।

একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের গুলি খেয়ে গণ্ডারটা তখন মাটির উপরে পড়ে গেল এবং বেবুনটাও একলাফে অন্য গাছে গিয়ে প্রাণ বাঁচালে। তারপর সকলে মিলে মানিকবাবুকে প্রায় মরো মরো অবস্থায় গাছের উপর থেকে নামিয়ে আনলে ।

এবং সেই রাত্রেই আর-এক ব্যাপার! সেদিন আহারের ব্যবস্থা ছিল কিছু গুরুতর। কুমার মেরেছিল দুটো বুনো হাঁস এবং বিমল মেরেছিল একটা হরিণ। কাজেই সারাদিনই আজ রামহরির হাত জোড়া। কি আমিষ কি নিরামিষ রন্ধনে সে ছিল অদ্বিতীয় এবং রান্নাবান্নায় যত বেশি সময় পাওয়া যায় সে হত তত বেশি খুশি।

রাত্রিবেলায় রামহরি এসে যখন সুধোলে, “খোকাবাবু, খাবার দেব কি?” বিমল তখন জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার আজকের রান্নার ফন্দটা কি শুনি?”

রামহরি বললে, “চপ, কাটলেট, কোপ্তা, রোস্ট, আলুমাকাল্লা আর লুচি। একটা চাটনিও আছে।”

কুমার খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে বললে, “রামহরি, তুমি অমর হও! তোমার দয়ায় আমরা বনবাস করতে এসেও স্বর্গ খুঁজে পেয়েছি!”

মানিকবাবুর জিভ দিয়ে জল গড়াতে লাগল! লম্বা একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "আহা, রামহরি, কি মধুর কথাই শোনালে। আজ দিনের বেলাটায় বেবুনের মুখ খিঁচুনি আর গণ্ডারের তাড়া খেয়ে প্রায় মরো-মরো হয়ে আছি, এখন দেখা যাক্, রাতের বেলায় তোমার হাতের অমৃত খেয়ে আবার ভালো করে চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারি কিনা!"

বিমল বললে, "রক্ষে করুন মানিকবাবু, আপনি আরো ভালো করে চাঙ্গা আর হবেন না! আফ্রিকায় এসে আপনার ভুঁড়ির বহর দুগুণ বেড়ে গিয়েছে, সেটা লক্ষ্য করেছেন কি?"

মানিকবাবু মুখ ভার করে বললেন, "আপনারা যখন-তখন আমার ভূঁড়ির ওপরে নজর দেন । এটা আমি পছন্দ করি না।"

বিমল হেসে বললে, "কিন্তু আপনার ভুঁড়ি যদি এভাবে বাড়তেই থাকে, তাহলে আফ্রিকার প্রত্যেক সিংহের নজর আপনার ওপরে পড়বে, সেটা আপনি ভেবে দেখছেন কি?"

মানিকবাবু চমকে উঠে বললেন, 'ও বাবা, বলেন কি?"

—"হ্যাঁ । মানুষরা যখন মোটা পাঁঠা খোঁজে, তখন সিংহরাও নধর চেহারার মানুষ খুঁজবে না কেন?"

মানিকবাবু ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বললেন, "খাওয়ার কথা শুনে আমার মনে যে আনন্দ হয়েছিল, আপনার কথা শুনে সে আনন্দ কর্পূরের মত উবে গেল...... বিমলবাবু আফ্রিকায় আমাদের আরো কতদিন থাকতে হবে?"

বিমল বললে, "এই তো সবে কলির সন্ধ্যে! আপাতত আমরা যেখানে আছি, এ জায়গাটার নাম হচ্ছে, ট্যাবোরা। এখান থেকে উজিজি আরো কিছুদিনের পথ। পথের বিপদ এড়িয়ে আগে উজিজিতে গিয়ে পৌঁছোই, তারপর অন্য কথা। আমাদের আসল অ্যাডভেঞ্চার শুরু হবে উজিজি থেকেই।"

—"আসল অ্যাডভেঞ্চার, মানে তো আসল বিপদ? অর্থাৎ আপনি বলতে চান তো, যে, উজিজিতে গিয়ে পৌছোবার পরে প্রতিক্ষণেই আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে?"

—"হ্যাঁ।"

—"কেন? ঘটোৎকচ তো আর আমাদের পিছনে নেই!"

কুমার বললে, "এখন নেই বটে, কিন্তু দুদিন পরে নিজের ভ্রম বুঝতে পারলেই আবার সে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসবে।"

মানিকবাবুর মুখের ভাব যেরকম হল, সেটা আর বর্ণনা না করাই ভালো।

আচমকা কুমারের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের ঘোর কাটবার আগেই সে বেশ বুঝতে পারলে, তার মুখের উপরে কার উত্তপ্ত শ্বাস পড়ছে। সে শ্বাসে কী দুর্গন্ধ!

খুব সন্তর্পণে আড়চোখে চেয়ে দেখলে, অন্ধকার তাঁবুর ভিতরে কার দুটো বড় বড় চোখ দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে।

উত্তর নিঃশ্বাসটা তার মুখের উপর থেকে সরে গেল । কুমার অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইল—কারণ, একটু নড়লেই মৃত্যু নিশ্চয়। জ্বলন্ত চোখ দুটো যে তার পানেই তাকিয়ে আছে, এটাও সে বেশ বুঝতে পারলো।

বাইরে বনভূমি তখন ঘনঘন সিংহের গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠছে। চারিদিক থেকে আরো যে কতরকম চিৎকার শোনা যাচ্চে তা বলবার নয়। মানুষেরা ঘুমোচ্ছে, কিন্তু তাদের শত্রুরা এখন জাগরিত ।

এ তাঁবুর ভিতরে বিমল আর মানিকবাবুও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন কিন্তু এখন কাউকে সাবধান করারও সময় নেই।

তাঁবুর ভিতরে এই সময়ে কার আবির্ভাব হল? এ মানুষ না কোন হিংস্র জন্তু?

এ ঘটোৎকচ নয় তো? সে কি এখনি তার ভ্রম বুঝতে পেরেছে?

কিছুই বুঝবার উপায় নেই। যে শত্রু তাদের গ্রাস করতে এসেচে অন্ধকার তাকে গ্রাস করেছে। কেবল দুটো প্রদীপ্ত চক্ষু এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে আর আসছে-যাচ্ছে আর আসছে। সে যেন অন্ধকারের চক্ষু। মায়াহীন উপবাসী চক্ষু, তারা যেন বিশ্বকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে চায়!

আচম্বিতে কী একটা শব্দ হল। একটা কি ভারী জিনিস পড়ার শব্দ....

কুমার আর থাকতে পারলে না, এক লাফে উঠে বসে পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে চেচিয়ে উঠল, "বিমল, বিমল!"

সঙ্গে সঙ্গে বিমলের গলা পাওয়া গেল, "কী হয়েছে কুমার, কী হয়েছে?"

—"ঘরের ভেতরে কে এসেছে?"

পরমুহুর্তে বিমলের টর্চ জ্বলে উঠল। কিন্তু কৈ, ঘরের ভেতরে তো কেউ নেই!

বিমল বললে, "এ কি! মানিকবাবু কোথায় গেলেন?"

কুমার বিস্মিত চক্ষে দেখলো, তাঁবুর ভিতরে মানিকবাবু নেই, তার বিছানাও নেই।

গভীরতর অরণ্য

বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে বিমল চেঁচিয়ে ডাক দিলে, “মানিকবাবু! মানিকবাবু!” মানিকবাবুর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

কুমার বললে, “মানিকবাবু তো এই রাত্রে একলা বাইরে বেরুবার পাত্র নন!”

—“হ্যাঁ”

—“কে সে? মানুষ না জন্তু?”

_“জানি না!”

—“দেখ, মানিকবাবুর বিছানায় তার লেপখানাও নেই! লেপ মুড়ি দিয়ে কেউ বাইরে বেরোয় না। লেপসুদ্ধ নিশ্চয় কেউ তাকে ধরে নিয়ে গেছে!”

—“কে তাঁকে ধ’রে নিয়ে যাবে? কোন জন্তু?”

—“ঘটোৎকচ যে আসেনি, তাই-বা কে বলতে পারে।"

বাহির থেকে কে কাতর-কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, “ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে!”

—‘ঐ মানিকবাবুর গলা! এস কুমার, আমর সঙ্গে এস।”

-- বলতে বলতে বিমল নিজের বন্দুকটা তুলে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

সে-রাত্রে আকাশ থেকে চাঁদ আলোর ধারা ঢালছিল বটে, কিন্তু সে-আলো যেন আরো বেশি করে প্রকাশ করে দিচ্ছিল নিবিড় অরণ্যের ভীষণ বিজনতাকে।

গাছের পর গাছ পরস্পরকে জড়াজড়ি করে যে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কেঁপে কেঁপে শিউরে শিউরে উঠছে – – তারা এইমাত্র একটা ভয়ানক কাণ্ড দেখতে পেয়েছে।

বন এত ঘন যে, চাঁদের আলোতেও তার ভিতর নজর চলে না।

বনের বাইরেই একটুখানি পথের রেখা, তারপরেই ছোট একটি মাঠ। সেখানেই আজ তাঁবু খাটানো হয়েছে।

এদিকে-ওদিকে চারিদিকে তাকিয়েও বিমল ও কুমার কোন জীবজন্তু বা মানিকবাবুকে আবিষ্কার করতে পারলে না।

—“মানিকবাবু! মানিকবাবু!”

দূর থেকে সাড়া দিলে কেবল প্রতিধ্বনি। তারপরেই আলো অনেক দূর থেকে অনেকগুলো সিংহ একসঙ্গে ঘন-ঘন গর্জন করতে লাগল! কী-একটা অজানা জানোয়ারের মৃত্যু-আর্তনাদ শোনা গেল। একদল শেয়াল চেঁচিয়ে জানতে চাইল -- “কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া ?”

কুমার কাতরভাবে বললে, “মানিকবাবু বোধহয় আর বেঁচে নেই।”

বিমল কান পেতে কি শুনছিল। সে বললে, “মানিকবাবু বেঁচে আছেন কিনা জানি না, কিন্তু যে শত্রু আজ আমাদের তাঁবুতে এসেছিল, বোধহয় ঐখানটা দিয়ে সে বনের ভেতর ঢুকেছে—বলে সে বনের একজায়গায় অঙ্গুলি-নির্দেশ করে দেখাল!

কুমার বললে, “কী করে জানলে তুমি?”

—“শুনছ না, ঐখানটার গাছের ওপরে পাখি আর বাঁদররা কিচির-মিচির করছে? যেন কোন অস্বাভাবিক কাণ্ড দেখে ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, আর ঘুমোতে পারছে না।”

–“তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত?”

—“এখনি ঐ বনের ভিতর ঢুকব।”

–“লোকজনদের ডাকব না?”

—“সে সময় কোথায়? বলেই বন্দুকটা বগলদাবা করে বিমল অগ্রসর হল।

—“ঠিক বলেছ" বলে কুমারও তার পিছন ধরল।

ভীষণ বন! ভালো করে ভিতরে ঢুকতে না-ঢুকতেই কাঁটা ঝোপের আক্রমণে বিমল ও কুমারের জামা গেল ছিন্নভিন্ন হয়ে, সর্বাঙ্গ গেল ক্ষতবিক্ষত হয়ে । এমন অসময়ে, এই দুর্গম, অরণ্যে মানুষকে ঢুকতে দেখে বিস্মিত বানর ও পাখির দল আরো জোরে কলরব করে উঠল।

কুমার বললে, "বিমল, এদিক দিয়ে আর এগোবার চেষ্টা করা বৃথা। এখান দিয়ে কোন জীব যেতে পারে না_আমাদের শত্রু নিশ্চয় এ পথ দিয়ে যায়নি।"

টর্চের আলো একটা ঝোপের উপর ফেলে বিমল বললে, "দেখ ।"

কুমার সবিস্ময়ে দেখলে, একটা কাঁটাগাছে সাদা একখানা কাপড় ঝুলছে। সে বললে, কী ও?"

—"মানিকবাবুর বিছানার চাদর । এখন বুঝছ তো, শত্রু কোন পথে গেছে?"

বিমল চাদরখানা নেড়েচেড়ে ভালো করে দেখে বললে, "এখন পর্যন্ত মানিকবাবু যে আহত হয়েছেন, এমন কোন প্রমাণ পেলুম না! কুমার, দেখে, চাদরে রক্তের দাগ নেই।"

কুমার বললে, "ভগবান, তাকে বাঁচিয়ে রাখুন। নইলে তার জন্যে দায়ি হব আমরাই। কারণ, আমরাই তাকে জোর করে এই বিপদের ভেতর টেনে এনেছি। আহা, বেচারা..."

"শুধু বেচারা নয়, গো-বেচারা। এইরকম সব গো-বেচারা সন্তান প্রসব করছেন বললেই বাংলা-মায়ের আজ এমন দশা । আমাদের বঙ্গ-জননীকে ব্যাঘ্রবাহিনী বলে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু কোথায় সে ব্যাঘ্র?"

কুমার বললে, "আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বন্দি হয়ে হালুম-হুলুম করছে।"

বিমল বললে, "কিন্তু যেদিন খাঁচা ভেঙে বেরুবে, মায়ের ভক্ত এই গো-বেচারার দল কী করবে?"

সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কুমার বললে, "বিমল, দেখ,দেখ!"

কুমারের টর্চের আলো একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় গিয়ে পড়েছে। সেখানে পড়ে আছে একটা চিতাবাঘের দেহকে জড়িয়ে ধরে মস্ত বড় একটা অজগর সাপ | অজগরের সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন। বাঘ আর সাপ, কেউ নড়ছে না ।

বিমল খুব সাবধানে কয় পায় এগিয়ে গিয়ে বললে, "হু, ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। সর্পরাজ ভুল শিকার ধরেছিল। যদিও তার আলিঙ্গনে পড়ে ব্যাঘ্রমশাইকে স্বর্গ দেখতে হয়েছে, তবু চোখ বোজবার আগে আঁচড়ে-কামড়ে আদর করে সর্পরাজকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে গিয়েছে।"

বিমল বন্দুকের নলচে দিয়ে সাপ আর বাঘের দেহকে দু-চারবার নাড়া দিল। তারা মরে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে আছে।

একটু তফাতে ঝোপের ভিতর থেকে তিন-চারটে হায়েনার মাথা দেখা গেল ।

কুমার বললে, "চল বিমল, হায়েনার দল আসন্ন ভোজের আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমাদের দেখে ওরা এদিকে আসছে না - ওকি বিমল, তোমার মুখ হঠাৎ ও রকমধারা হয়ে গেল কেন?" বিমল যেদিকে তাকিয়েছিল, সেইদিকে তাকিয়ে কুমারও যা দেখলে, তাতে তার গায়ের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে গেল!

সামনের ঝোপের ভিতরে প্রকাণ্ড একখানা কালো মুখ জেগে উঠেছে! সে মুখ মানুষের মতন বটে, কিন্তু মানুষের মুখ নয়!

ঠিক তার পাশের ঝোপ দুলে উঠল এবং সেখানেও দেখা দিলে আর-একখানা তেমনি কালো, কুৎসিত, নিষ্ঠুর,—মানুষের মতন, অথচ অমানুষিক ভীষণ মুখ!

আর-একটা ঝোপ দুলিয়ে আবার আর একখানা ভয়ঙ্কর মুখ বাইরে বেরিয়ে এল!

তার পরেই একটা গাছের উপর থেকে দুম দুম দুম করে মাটি কাঁপিয়ে আবির্ভূত হল দানবের মতন মস্ত আরো চার-পাঁচটা মূর্তি।

কুমার শুকনো গলায় অস্ফুট-স্বরে বললে, "বিমল, আর রক্ষে নেই - আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত!"

বিমল কিছু বললে না, তার মুখ স্থির। প্রথম যে মূর্তিটা মুখ বাড়িয়েছিল, ঝোপের আড়াল থেকে ধীরে ধীরে সে বাইরে এসে দাড়ালো ।

বিমল বললে, "কুমার, এরা আমাদের আক্রমণ করবে। এরা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি বলিষ্ঠ,–বনের হিংস্র জন্তুরা পর্যন্ত ভয়ে এদের ছায়া মাড়ায় না। এরা কী জীব, তা জানো তো?"

–"হু, গরিলা।"

—"তাহলে মরবার জন্যে প্রস্তুত হও।"

শৃঙ্গী হস্তী

বিমল এমন শান্তস্বরে বললে, যে, “তাহলে মরবার জন্যে প্রস্তুত হও,– কুমার সমস্ত বিপদের কথা ভুলে তার মুখে পানে আর একবার না তাকিয়ে থাকতে পারলে না। অবশ্য এ অভিজ্ঞতাও তার পক্ষে নতুন নয়। কারণ, কুমার বরাবরই দেখে এসেছে, বিপদ যত গুরুতর হয়, বিমলের মাথাও হয়ে ওঠে তত বেশি শান্ত। বিপদকে সে খুব সহজভাবেই গ্রহণ করত বলে তার বিরুদ্ধে অটল পদে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত বুঝতেও পারত!

কুমারের কাছেও বিপদ অপরিচিত নয়। আসামের জঙ্গলে যখের ধন আনতে গিয়ে, মঙ্গল গ্রহের বামনদের হাতে বন্দি হয়ে, এবং ময়নামতির মায়াকাননে পথ হারিয়ে যতরকম মহাবিপদ থাকতে পারে, সে-সমস্তেরই সঙ্গে তাকে পরিচিত হতে হয়েছে, সুতরাং আজকের এই মস্ত বিপদ দেখেও কুমারের মনের ভাব যেরকম হল, তা কাপুরুষের মনের ভাব নয়।

এত দেশ বেড়িয়েও বিমল ও কুমার আজ পর্যন্ত স্বচক্ষে জ্যান্ত গরিলা দেখে নি! আজ তাদের প্রথম দেখে তারা বুঝতে পারলে যে পশু রাজা সিংহ পর্যন্ত গরিলা দেখে কেন মানে-মানে পথ ছেড়ে দেয়। এরা যে শক্তি সাহস ভীষণতা ও নিষ্ঠুরতার জীবন্ত মূর্তি তাদের হিংস্র চক্ষু, দাঁতওয়ালা মুখ আর মস্ত বুকের পাটা দেখলে প্রাণমন আঁৎকে ওঠে। আকারে তারা অন্য সব জীবের চেয়ে মানুষেরই কাছাকাছি আসে বটে, কিন্তু তবু তাদের চেহারার সঙ্গে স্যান্ডোর মতন কোন মহাবলবান মানুষেরও তুলনা হয় না। তাদের হাতের এক চড় খেলে স্যান্ডোর কাঁধ থেকেও মাথা বোধ হয় উড়ে যেত ।

সর্বপ্রথমে যে গরিলাটা ছিল, সেই-ই বোধহয় দলের সর্দার। হঠাৎ সে দুহাতে বুক চাপ্‌ড়ে গর্জন করে উঠল।

বিমল বললে, “বন্দুক ছোঁড়ো কুমার। ওরা এই বারে আমাদের আক্রমণ করবে! ওরা বেশি কাছে এলে আমরা আর কিছুই করতে পারব না।”

বিমলের কথাই ঠিক! সর্দারের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য গরিলাগুলোও দুই হাতে বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে ও গজরাতে-গজরাতে অগ্রসর হতে লাগল।

প্রায় একসঙ্গেই বিমল ও কুমারের বন্দুক সশব্দে অগ্নি উদগার করলে! সর্দার গরিলার গায়ে বোধহয় গুলি লাগল! চিৎকার করে বসে পড়তেই সে আবার উঠে দাঁড়াল !

কিন্তু উপরি-উপরি দু-দুটো বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গেই আর-এক কাণ্ড! বিমল ও কুমারের পিছন দিকের বামপাশের বনের ভিতর থেকে আচম্বিতে যেন একদল দানব ঘুম থেকে জেগে উঠল! তারপর সে কী মাতামাতি আর দাপাদাপির শব্দ! মাটি কাঁপতে লাগল থর থর করে তিন-চারটে গাছ ভেঙে পড়ল মড়ুমড়ু করে! কারা যেন দ্রুতপদে ধেয়ে আসছে।

গরিলাগুলো এক মুহূর্তের মধ্যে কে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, তার আর কোনই পাত্তা পাওয়া গেল না।

দুটো সিংহ কোথা থেকে বেরিয়ে বিদ্যুতের মতন আর-এক দিকে দৌড়ে গেল -- বিমল ও কুমারের পানে ফিরেও তাকালো না!

কুমার সবিস্ময়ে বললে, ‘ওরা কারা আসছে, –ওদের দেখে গরিলারা আর সিংহেরাও ভয়ে পালিয়ে গেল?”

কুমারকে টেনে নিয়ে বিমল একটা ঝোপের ভিতরে ঢুকে গুড়ি মেরে বসে পড়ল। তারপর বনের ভিতর থেকে বেরুল একে-একে বারো-তেরোটা চলন্ত পাহাড়ের মতন মূর্তি,–চারিদিকে ধুলো ও শব্দে ঝড় বহিয়ে তারা বেগে আর একটা জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল! বিমল বললে, “হাতির দল। আমাদের বন্দুকের আওয়াজে ভয় পেয়েছে।”

কুমার বললে, “হাতি। হাতির মাথায় কি শিং থাকে?”

বিমল বললে, “কুমার, অন্তত তোমার আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। আর কোন মানুষেরা চোখে যা দেখে নি, ময়নামতি মায়াকাননে গিয়ে সেই-সব অদ্ভুত জীবও তুমি তো দেখে এসেছ?”

কুমার বললে, “ময়নামতির মায়াকানন হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া, দেশ,-আর এ হচ্ছে আফ্রিকা। এখানে যে শৃঙ্গ হস্তী পাওয়া যায়, এমন কথা আমি কোনদিন শুনিনি।”

বিমল বললে, “কিন্তু এই শৃঙ্গ হস্তীর কথা সম্প্রতি আমি একখানা ইংরেজি কেতাবে পড়েছি। এরা দুর্লভ জীব,–খুব কম লোকই দেখেছে। এখনো অনেকে এদের কথা বিশ্বাস করে না .....যাক, এখন আর এ-সব আলোচনায় দরকার নেই। চাঁদ পশ্চিম আকাশে নেমে গেছে। গরিলারা আবার দেখা দিতে পারে । আশে পাশে সিংহরা গর্জন করছে। অন্ধকার হবার আগেই আমাদের তাবুতে ফিরে যেতে হবে।”

কুমার কাতরকণ্ঠে বললে, “সবই তো বুঝছি, কিন্তু মানিকবাবুর কোন খোঁজই তো পাওয়া গেল না ।”

বিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, “সেটা আমাদের দোষ নয়। আজ আর খোঁজাখুঁজি বৃথা। কাল সকালে আবার সে-চেষ্টা করা যাবে।”

কুমার বললে, “মানিকবাবু আর বেঁচে নেই।”

সে কথার জবাব না দিয়ে বিমল বলল, “ওঠ কুমার” ।

দুজনে আবার জঙ্গল ভেঙে পথ খুঁজতে লাগল কিন্তু পথ কোথায়? যেখানেই টর্চের আলো পড়ে, সেখানেই ছোট বড় ঝোপঝাপ বা নিবিড় অরণ্য ছাড়া অপর কিছুই দেখা যায় না।

বিমল বললে, “আমরা যে দিক দিয়ে এসেছি, সেদিক দিয়ে ফিরতে গেলেই আবার গরিলাদের কবলে গিয়ে পড়ব । এখন কী করা যায়? এই বনে বসেই কি রাত কাটাতে হবে?”

কুমার মাটির উপরে টর্চের আলো ফেলে বললে, "দেখ, এখানে কতরকম জন্তুর পায়ের দাগ । মাটিও যেন স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করছে । এর কারণ কী?"

বিমল হেঁট হয়ে কিছুক্ষণ দেখে বললে, "হ্যাঁ। গণ্ডার, হিপো, হাতি, সিংহ, হরিণ নানারকম জীবেরই পায়ের দাগ দেখছি বটে। মাটিও খুব নরম। নিশ্চয়ই কাছে কোন জলাশয় আছে – এইখান দিয়ে জানোয়ারেরা জল খেতে যায়। কুমার, আর কোন ভয় নেই -- কাছেই একটা-না-একটা পথ আছেই যদিও সেটা তাঁবুতে ফেরবার পথ নয়, তবু পথ তো!"

বিমলের কথাই সত্য। সামনে একটা বড় ঝোপের আড়ালেই জানোয়ারদের পায়ে-চলা পথ পাওয়া গেল। অদূরে আকাশ কাঁপিয়ে কী একটা বড় জন্তু চিৎকার করে উঠল।

বিমল বললে, "হিপোর চিৎকার। জলে সাঁতার কাটতে-কাটতে হিপোর দল মঝে মাঝে চেঁচিয়ে মনের আরাম জানায়।"

পথ দিয়ে এগুতে-এগুতে বিমল বললে, "কুমার, চারিদিকে চোখ রেখে সাবধানে চল। এই পথে নানা জীব জল পান করতে যায়। তাই শিকার ধরবার জন্যে বাঘ আর সিংহেরা আশেপাশে ওঁৎ পেতে বসে থাকে।"

সৌভাগ্যক্রমে ব্যাঘ্র বা সিংহ কারুর সঙ্গেই শুভদৃষ্টি হল না। পথ শেষ হতেই সামনে দেখা গেল প্রকাণ্ড এক জলাশয়। তার দিকে কালো বনের আড়ালে অদৃশ্য হবার আগে চাঁদ ম্লান-চোখে পৃথিবীকে শেষ-দেখা দেখে নিচ্ছে। জলের ভিতরে অনেকগুলো জীব ডুব দিচ্ছে বা সাঁতার কাটছে -- দূর থেকে তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

বিমল বললে, "হিপোপটেমাস।"

কুমার বললে, "আঃ, জল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা হল। যা তেষ্টা পেয়েছে!" বলেই সে একদৌড়ে জলের ধারে গিয়ে তীরের উপর উপুড় হয়ে পড়ল। তারপর হাত বাড়িয়ে অঞ্জলি করে জলপান করতে যাবে, অমনি জলের ভিতর থেকে

বিদঘুটে দুঃস্বপ্নের মতন একখান প্রকাণ্ড ও ভীষণ মুখ ঠিক তার মুখের সুমুখেই হঠাৎ জেগে উঠল এবং সেই সঙ্গেই পিছন থেকে বন্দুকের শব্দ এবং জলের ভিতরে ভয়ানক তোলপাড়!

এক টানে কুমারকে জলের ধার থেকে সরিয়ে এনে বিমল বললে, "বন্ধু, সাত-তাড়াতাড়ি জল খেতে গিয়ে এখনি কুমিরের জলখাবার হয়েছিলে যে! যাক তুমি ঠাণ্ডা না হও, কুমিরের পোকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি, অরে ও আবার কী ?"

খানিক তফাতেই একটা মস্ত জানোয়ার দাঁড়িয়ে বন্দুকের শব্দে খাপ্পা হয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে।

—"বোধহয় গণ্ডার। পালিয়ে এস কুমার, পালিয়ে এস।"

বিমল ও কুমার যত-জোরে-পারে দৌড় দিয়ে আবার নিবিড় জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকলে—ধুপ ধুপ শব্দ শুনে বুঝলে গণ্ডারটাও তাদের পিছনে পিছনে ছুটে আসছে।

জঙ্গলের ভিতর আর দৌড়োবার উপায় নেই -- চারিদিকেই অন্ধকার আর গাছপালা, দৌড়োবার চেষ্টা করলে কোন গাছের ধাক্কা লেগে হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। বিমল বললে, "কুমার শুয়ে পড়!"

তারা শুয়ে-পড়ার সঙ্গে পাঞ্জাব মেলের ইঞ্জিনের মত বেগে ছুটে এসে, গণ্ডারটা ঠিক তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল -- সামনের জঙ্গল ছত্রভঙ্গ করে গাছপালা কাঁটাঝোপে ভেঙেচুরে!

খানিক পরে বিমল উঠে বসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, "ভাগ্যে গণ্ডারদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নয়, আর তারা একরোখা হয়ে ঠিক সোজা পথে ছোটে, তাই এ-যাত্রাও বেঁচে যাওয়া গেল।"

কুমার বললে, "এ কী কঠিন ঠাঁই বাবা! প্রাণ বাঁচাতে বাঁচাতেই প্রাণ তো যায়-যায় হয়ে উঠল!—উঃ!" •.

জঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে চোখ চালিয়ে বিমল বললে, "ঐ চাঁদ অস্ত গেল। ব্যস্, আজকের রাতের মত বনবাস ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঐ যাঃ! কুমিরটাকে গুলি করবার সময় টর্চটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, গণ্ডারের তাড়া খেয়ে সেটা আর তুলে আনবার সময় পাই নি!"

কুমার বললে, "আমার অবস্থা তোমার চেয়েও খারাপ। জল খাবার সময়ে টর্চ আর বন্দুক দুটিই পাশে রেখেছিলুম। সে দুটো সেখানেই আছে।"

বিমল বললে, "কী সু-খবর! এই অন্ধকারেই আমার নৃত্য করতে ইচ্ছে করছে।"

কুমার গুম্ হয়ে রইল!......

বিরাট অন্ধকার নিয়ে বিপুল অরণ্য তাদের বুকের উপরে ক্রমেই যেন চেপে বসতে লাগল। দূরে দূরে আশে-পাশে কাদের সব আনাগোনার শব্দ--কখনো থেমে থেমে কখনো তাড়াতাড়ি, কখনো ধীরে ধীরে। চারিদিকে কারা যেন নিঃশব্দে পরামর্শ বা ষড়যন্ত্র করছে, চারিদিকে কারা যেন চক্ষুহীন চক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে-চারিদিকে ঝিঁঝিঁদের অশ্রান্ত আর্তনাদ, গাছের পাতায়-পাতায় বাতাসের কান্না।

আরো যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ। সে আশীর্বাদ হারালে পৃথিবীর রূপ বদলে যেতে বিলম্ব হয় না।

পূর্বে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে কেবল অন্ধকারের মহাবন্যা বইছে। বিমলের মনে হলো, এমন অন্ধকার সে ভারতবর্ষে কখনো দেখে নি,–এ অসম্ভব শব্দময় অন্ধকারের গর্ভে বন্দী হওয়ার চেয়ে সিংহ, গণ্ডার বা গরিলার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোও ভালো,—এ অন্ধকার তাকে যেন অন্ধ আর দম বন্ধ করে হত্যা করতে চায়! বিমলের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল—নিজের দুর্বলতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে সে ভাবতে লাগল, আজ কেন তার এ-রকম দুশ্চিন্তা হচ্ছে?

হঠাৎ খুব কাছেই কতকগুলো শুকনো পাতা মড়-মড় করে উঠল, তারপরেই সব চুপচাপ!

কোন অদৃশ্য শত্রু কি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে? কোন হিংস্রজন্তু কি আবার তাদের আক্রমণ করতে চায়? তার আত্মা কি আগে থাকতে সেটা জানতে পেরে তাকে সাবধান করে দিচ্ছে? এই অজ্ঞাত ভয় কি তাহলে অমূলক নয়? বিমল প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না।

সে অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে চুপি-চুপি ডাকলে, "কুমার!"

—'কী বলছ?"

--"কাছেই একটা শব্দ শুনলে? পায়ের শব্দের মত?"

—'হু! একটু আগে আমার মনে হলো, কারা যেন ফিসফিস্ করে কথা কইছে।"

—"ওটা তোমার শোনবার ভুল। কিন্তু শুকনো পাতার উপরে একটা শব্দ হয়েছে। হয়তো কোন জীবজন্তু!"

_"সম্ভব ।"

—"কিন্তু দেখবার কোন উপায় নেই। অন্ধকারে আমরা এখন অন্ধ।"

"আমার কাছে একটা দেশলাই আছে। জ্বালব নাকি?"

বিমল কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আচম্বিতে কারা তার উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল--কোন রকম আত্মরক্ষার চেষ্টা করার আগেই মাথার উপরে সে ভীষণ এক আঘাত অনুভব করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।

শত্রুর কবলে

যখন জ্ঞান হলো, চোখ মেলে বিমল দেখলে যে, ভোরের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে ।

প্রথমে তার কিছুই স্মরণ হলো না; তার মনে হলো সে সবে ঘুম থেকে জেগে উঠলো। কিন্তু হঠাৎ ব্যথা অনুভব করে সে মাথায় হাত দিলে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ভিজে গেল। চমকে হাতখানা চোখের সামনে এনে সে দেখলে, হাতময় রক্ত!...তখন তার সব কথা মনে পড়ল।

সে চিৎ হয়ে শুয়েছিল, তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তারপর যে-দৃশ্য দেখলে, তাতে তার বুকের ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল ।

তার চারিদিকে গোল হয়ে প্রায় ৩০/৪০ জন লোক বসে আছে। প্রত্যেকেরই চেহারা কারো যেন কষ্টিপাথর, দেহ প্রায় উলঙ্গ, কেবল কোমরে লেংটির মতো একখানা ন্যাকড়া জড়ানো। তাদের প্রত্যেকেরই হাতে একটি করে বর্শা, সকালের রোদে বর্শার ফলাগুলো জ্বলে-জ্বলে উঠছে আগুনের ফুলকির মতো। লোকগুলো যে আফ্রিকারই বুনোমানুষ, বিমলের তা বুঝতে বিলম্ব হলো না। তার পরে হঠাৎ বাংলা কথা শুনে তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে বসল এবং সবিস্ময়ে দেখলে, খাঁকি পোষাক-পরা তিনজন লোক সেখানে বসে আছে। তারা পরস্পরের সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই কথাবার্তা কইছে ;–সুতরাং তারা যে বাঙালি সে বিষয়ে তার সন্দেহ রইলো না ।

আর একটু লক্ষ্য করে দেখে সেই তিনজনের ভিতরে দুজনকে সে চিনতেও পারলে, তাদের একজনকে সে মোম্বাসার হোটেলের ভিতরে দেখেছিল এবং তিনি হচ্ছেন মানিকবাবুর ছোট কাকা সেই মাখনবাবু।

আর-একজন হচ্ছে সেই রামু, কলকাতায় মানিকবাবুর বাড়িতে ম্যাপ চুরি করবার জন্যে যে চাকর সেজে কাজ নিয়েছিল।

বিমলকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে মাখনবাবু গাত্রোত্থান করে এগিয়ে এলেন। তারপর হাস্যমুখে বললেন, “কী বিমলবাবু, এখন কেমন আছেন?”

বিমল কোন জবাব দিলে না।

—“আমার সঙ্গের লোকগুলোকে দেখে কি আপনার ভয় করছে ? ভয়েই কি আপনার মুখ দিয়ে কথা বেরচ্ছে না?”

মাখনবাবুর চোখের উপরে চোখ রেখে শান্তস্বরে বিমল বললে, “ভয়ের সঙ্গে এ-জীবনে কোনদিন পরিচয় হয় নি--এ জগতে কারুকে আমি ভয় করি না।”

মাখনবাবু হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, “আপনি যে খুব একজন সাহসী ব্যক্তি সেটা জেনে খুশি হলুম। কিন্তু আপনার এ-সাহস আজ কোনো কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে না।”

বিমল সে কথায় কোন জবাব না দিয়ে বললে, “আপনাকে আমি চিনি। আপনি মানিকবাবুর কাকা মাখনবাবু। কিন্তু আমাকে আপনারা ধরে এনেছেন কেন?"

মাখনবাবু বললেন, "ধরে এনেছি কেন? নিমন্ত্রণ করলে আপনি আসতেন না বলে ।”

—“কিন্তু আমি আসি-না আসি, তাতে আপনার কী আসে যায়?”

—“আসে-যায় অনেকখানি । বেশি কথায় দরকার নেই, একেবারেই আসল কথা শুনুন। আপনার কাছ থেকে আমি একখানা ম্যাপ চাই ।”

বিমল বিস্ময়ের ভান করে বললে, “ম্যাপ? কিসের ম্যাপ?”

—“ম্যাপখানা যে কিসের, তা আমিও জানি, আপনিও জানেন। তা নিয়ে আর লুকোচুরি করা বৃথা। সে ম্যাপখানা আমার হাতে দিন, সমস্ত গোলমাল এখুনি মিটে যাবে।”

—"একখানা ম্যাপ আমার কাছে ছিল বটে, কিন্তু মোম্বাসার হোটেলে সেটা চুরি গেছে, একথা আপনি জানেন বোধহয়?"

–"হ্যাঁ। কিন্তু সেখানা যে জাল ম্যাপ তাও আমার অজানা নেই। বিমলবাবু, আপনার চালাকিকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু ও চালাকির চাল আজ আর চলবে না। আপনি বুদ্ধিমান, ম্যাপখানা যে এখন আমাকে দেওয়াই উচিত একটু ভেবে দেখলেই তা বুঝতে পারবেন!"

বিমল চুপ করে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললে, "সে ম্যাপ এখন আপনাকে আমি কী করে দেবো? সেখানা তো আমার কাছে নেই।"

মাখনবাবু বললেন, "ম্যাপখানা যে আপনার কাছে নেই তা আমরা জানি, কারণ, আমরা আপনার কাপড়-চোপড় খুঁজে দেখেছি। কিন্তু সেখানা আপনাদের তাঁবুর ভেতরে নিশ্চয় আছে । কোথায় আছে এখন কেবল সেইটেই আমরা জানতে চাই। একবার তার খোঁজ পেলে সেখানা হস্তগত করতে আমাদের বেশি বিলম্ব হবে না।"

বিমল বললে, "ম্যাপের ঠিকানা পেলেই আপনারা আমাকে ছেড়ে দেবেন তো?"

মাখনবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "আপনি খুব মূল্যবান জীবন নন। ম্যাপখানা পেলে পরেও আপনাকে ধরে রেখে আমাদের কোনই লাভ নেই!"

বিমল বললে, "আর ম্যাপের ঠিকানা যদি না বলি?"

—"তাহলে বিনা বাক্যব্যয়ে পরলোকে যাবার জন্যে প্রস্তুত হোন!"

বিমল আবার খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "আমি পরলোকে যাবার জন্যে প্রস্তুত, আপনারা কী করতে চান, করুন।"

মাখনবাবু কর্কশকণ্ঠে বললেন, "তাহলে ম্যাপের ঠিকানা আপনি বলবেন না? দেখুন, ভালো করে ভেবে দেখুন।"

বিমল বললে, “এর মধ্যে ভাববার কিছুই নেই। ম্যাপের ঠিকানা আমি বলবো না।”

—“বলবেন না? বলবেন না?”—বলতে-বলতে দারুণ ক্রোধে মাখনবাবুর সমস্ত মুখখানা লাল-টকটকে হয়ে উঠলো। একেবারে বিমলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তিনি আবার বললেন, “বিমলবাবু, আপনার সঙ্গে বেশি কথা কইবার সময় আমাদের নেই। আমাকে যারা চেনে তারা সবাই জানে, বেশি কথার মানুষ আমি নই। আমি হাসতে হাসতে মানুষকে আলিঙ্গন করতে পারি। আবার পরমুহূর্তে তেমনি হাসতে-হাসতেই তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারি। আর একমাত্র আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, ম্যাপের ঠিকানা আপনি দেবেন কিনা বলুন।”

বিমল হাসতে-হাসতে বললে,“আপনারা অনেক লোক আর আমি একলা আপনাদের বাধা দেবার শক্তি আমার নেই। আপনাদের যা খুশি করতে পারেন ম্যাপের ঠিকানা আমি বলবো না।"

মাখনবাবু হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন- “রামু!”

রামু তখনি উঠে মাখনবাবুর কাছে দাঁড়ালো।

মাখনবাবু বললেন, “এই হতভাগাকে এখনি ঐ গাছের ডালে লটকে দে।"

সামনেই একটা মস্তবড় গাছ অনেক উঁচুতে মাথা তুলে আকাশের অনেকখানি ছেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারই একটা লম্বা ডালে দড়ি ঝুলিয়ে রামু মহা-উৎসাহে ফাঁসির আয়োজনে লেগে গেল ।

বিমল আর-একবার চারিদিক চেয়ে দেখলে । সেই প্রায় উলঙ্গ অসভ্য লোকগুলো এক-একটা কালো পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসেছিল। কিন্তু তাদের চোখগুলো তখন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে ঠিক যেন সব নিষ্ঠুর হিংস্র পশুর মতো ।

নিজের অসাধারণ শক্তির কথা বিমল জানত। এবং ইচ্ছা করলে সে যে এখনই মরবার আগে অন্তত পাঁচ-ছয় জন শত্রুকে বধ করে যেতে পারে, এটাও তার অজানা ছিল না। কিন্তু অকারণে নরহত্যা করতে তার সাধ হলো না। কারণ, পাঁচ-ছ'জন শত্রুকে বধ করলেও তার মৃত্যু যে নিশ্চিত এটা সে বুঝতে পারলো। কাজেই সে আর কোনরকম বাধা দেবার চেষ্টা করলে না।

হঠাৎ পিছন থেকে কে এসে বিমলের দুই কাঁধের উপরে দুই হাত রাখলে। মুখ ফেরাতেই বিমলের চোখে পড়ল সেই প্রকাণ্ড লম্বা মড়া-দেঁতো কাফ্রিটার কদাকার মুখখানা। এও যে ভিড়ের ভেতরে ছিল এতক্ষণ বিমল তা দেখতে পায় নি।

মাখনবাবু হাকলেন, "রামু ফাঁস ঠিক হয়েছে তো?"

রামু বললে, "আজ্ঞে, সব তৈরি।"

মাখনবাবু বললেন, "তাহলে ওকে ঐখানে নিয়ে যাও!"

মড়া-দেঁতো বিমলের একখানা হাত ধরে টেনে বাওয়াব্, গাছের দিকে অগ্রসর হলো, বিমলও কোন বাধা না দিয়ে আস্তে-আস্তে তার সঙ্গে গাছের তলায় এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। রামু এক মুখ হাসি নিয়ে বিমলের গলায় দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে দিলে ।

মড়া-দেঁতো দড়ির অন্য প্রান্তটা ধরে বিমলকে টেনে শূন্যে তোলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

মাখনবাবু বললেন, "ছোকরা, এই শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, ম্যাপের ঠিকানা আমাকে বলবে কি ?"

বিমল অটল স্বরে বললে, "না।"

সঙ্গে-সঙ্গে মাখনবাব হুকুম দিলেন, "তাহলে ওকে টেনে তোল।"

চারপাশের লোকগুলো মহা-আনন্দে অজানা-ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো। মড়া-দেঁতো ফাঁসির দড়ি ধরে টান মারতে উদ্যত হলো --

—সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে উপরি-উপরি ছয় সাতটা বন্দুকের আওয়াজ ! পরমুহূর্তেই ভিড়ের ভেতর থেকে তিন জন লোক আর্তনাদ করে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়লো!

আবার অনেকগুলো বন্দুকের আওয়াজ -- আবার আরো কয়েকজন লোক মাটির উপরে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

ম্যাপের সন্ধান

ফট্ করে একটা বিশ্রী আওয়াজ, তারপরেই গোঁ-গোঁ! কুমার বেশ বুঝলে, কার মাথায় লাঠি পড়ল ।

জঙ্গলের ভিতরে স্যাঁৎসেঁতে ভিজে জমির উপরে সে নিজের ক্লান্ত দেহটাকে বিছিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তার অদৃষ্টে আজ বিশ্রাম নেই। শত্রুরা তাদের আক্রমণ করেছে এবং বিমল নিশ্চয়ই তাদের কবলে গিয়ে পড়েছে। কাদের ফিস্ ফিস্ করে কথাও তার কানে গেল। সে একা । এখন আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

নিবিড় অন্ধকারের ভেতরে মাটির উপর দিয়ে খুব সাবধানে গড়িয়ে গড়িয়ে সে ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল।

হঠাৎ একটা আলো জ্বলে উঠলো। কিন্তু শত্রুরা যে কারা, সেটা দেখবারও সময় সে পেলে না, সড়াৎ করে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়েই কুমার গুড়ি মেরে যতটা জোরে-পারা-যায়, এগিয়ে যেতে শুরু করলে। ......মিনিট পনেরো পরে যখন সে থামল, তখন কাঁটা-ঝোপে তার গা বয়ে রক্ত ঝরছে এবং গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে তার সারা দেহ থেঁতো হয়ে গেছে।

মাটির উপরে পড়ে খানিকক্ষণ কুমার কান পেতে রইল কিন্তু শত্রুর আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কতকটা আশ্বস্ত হয়ে সে শুয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল--

আর ভাবতে লাগল!....- বিমলের কী হলো ? সে বেঁচে আছে, না নেই? যদি এখনো বেঁচে থাকে, তাহলে তাকে উদ্ধার করবার উপায় কী?....

আচম্বিতে কুমারের মনে হলো, তার পাশেই কে যেন খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে আরো ভালো করে সে শোনবার চেষ্টা করলে ।

হ্যাঁ, নিঃশ্বাস যে পড়ছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই! কিন্তু কে এ? মানুষ না জন্তু? অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

সন্তর্পণের সঙ্গে কুমার আবার গড়িয়ে সরে যেতে গেল এবং একেবারে গিয়ে পড়ল একটা জ্যান্ত দেহের ওপরে!--সঙ্গে সঙ্গে আঁ আঁ করে একটা বিকট চিৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে কুমার মাটিতে শুয়ে শুয়েই সেই দেহটার উপরে জোড়া-পায়ে লাথি মারলে!

আবার চিৎকার হলো, “ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে, ওরে বাবা রে।”

এ যে মানিকবাবুর গলা! ধড় মাড়িয়ে উঠে বসে কুমার সবিস্ময়ে বললে, “অ্যাঁ, মানিকবাবু নাকি?”

—“ওরে বাবা রে, গেছি রে! ওরে বাবা রে, এই রাত-আঁধারে বন-বাদাড়ে নাম ধরে কে ডাকে রে! ওরে বাবা রে, শেষটা ভূতের হাতে পড়লুম রে!”

—“মানিকবাবু, মানিকবাবু শুনুন, আমি ভূত নই, আমি কুমার।”

–এই বলেই সে পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালালে। জোড়া-পায়ের লাথি খেয়ে মানিকবাবু তখন মাটির উপর পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, এখন কুমারের নাম শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন এবং চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, “অ্যাঁ কুমারবাবু? আপনি?”—বলতে বলতে মনের আবেগে তিনি কেঁদে ফেললেন।

কুমার অনেক কষ্টে মানিকবাবুকে শান্ত করে বললে, “আমরা তো আপনার খোঁজেই বেরিয়েছিলুম! কিন্তু আপনি এখানে এলেন কেমন করে?”

মানিকবাবু বললেন, “আরে মশাই, সে অনেক কথা, ভাবতেও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে_উঃ!’

কুমার বললে, “ভালো করে সব পরে শুনব তখন। এখন খুব সংক্ষেপে দুকথায় বলুন দেখি, ব্যাপারটা কী হয়েছিল?”

মানিকবাবু বললেন, “আচ্ছা, তবে সংক্ষেপেই শুনুন ... কাল রাত্রে তাঁবুর ভিতরে লেপমুড়ি দিয়ে তো দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছিলুম হঠাৎ আমার ঘুম গেল ভেঙে! সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আমার বিছানা যেন চলে বেড়াচ্ছে! প্রথমে ভাবলুম, আমি একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখছি কিন্তু তারপরেই বুঝলুম, এ-তো স্বপ্ন নয়,

এ-যে সত্যি! লেপের ফাঁক দিয়ে উকি মারতেই দেখলুম, চাঁদের আলোয় বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমি চলেছি! আমি একটু নড়তেই গরর-গরর করে একটা গর্জন হলো, আমিও একেবারে আড়ষ্ট! ও বাবা, ও যেন বুনো জন্তুর আওয়াজ! তোষক আর লেপ-শুদ্ধ সে আমাকে মুখে করে নিয়ে চলেছে, আর আমার দেহ তার মধ্যে কোনরকমে জড়িয়ে বন্দী হয়ে আছে! এখন উপায়? জানোয়ারটাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না, লেপ আর তোষক ফুঁড়ে তার দাঁতও আমার গায়ে বেঁধেনি।...হঠাৎ জানোয়ারটা একটা লাফ মারলে, কতকগুলো ঝোপঝাড় দুলে উঠল আর আমিও ভয়ে না চেঁচিয়ে পারলুম না-- সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিছানার ভেতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে একটা ঝোপের ভিতর গিয়ে পড়লুম। তাকিয়ে দেখি, মস্ত একটা সিংহ আমার বিছানা মুখে করে লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল!! আমি যে আর বিছানার ভেতরে নেই, সেটা সে টেরই পেল না। তারপর আর বেশি কথা কী বলব, সিংহটা পাছে আবার আমাকে খুঁজতে আসে, সেই ভয়ে আমি তো তখনি উঠে চম্পট দিলুম-কিন্তু কোথায়, কোনদিকে যাচ্ছি সে কথাটা একবারও ভেবে দেখলুম না। তার ফল হল এই যে, কাল রাত থেকেই পথ হারিয়ে, পদে-পদে খাবি খেয়ে বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি -বাঁচবার আর কোন আশাই ছিল না।”

মানিকবাবুকে বাধা দিয়ে কুমার বললে, “তারপর কী হলো আর তা বলতে হবে না; আমি সব বুঝতে পেরেছি।”

মানিকবাবু বললেন, “কিন্তু আপনি একলা কেন? বিমলবাবু কোথায়?”

কুমার ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, “বিমল এখন ইহলোকে না পরলোকে, একমাত্র ভগবানই তা জানেন।"

মানিকবাবু সচমকে বললেন, “ও বাবা, সে কী কথা?”

“চুপ বলেই কুমার মানিকবাবুর হাত চেপে ধরলে । খানিক তফাতেই জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে অনেকগুলো আলো দেখা গেল ।

মানিকবাবু চুপি চুপি বললেন, “ও কিসের আলো?”

—“আলোগুলো এইদিকেই আসছে। নিশ্চয়ই শত্রুরা আমাদের খুঁজছে।

– “ শত্রু? শত্রু আবার কারা?”

—“বোধ হয় ঘটোৎকচের দল ।”

—“ও বাবা, বলেন কী! এই বিপদের ওপরে আবার ঘটোৎকচ। গোদের ওপরে বিষফোঁড়া! তাহলেই আমরা গেছি!”– মানিকবাবু একেবারেই হাল ছেড়ে দিলেন।

আলোগুলো নাচতে-নাচতে ক্রমেই কাছে এসে পড়ল - অনেক লোকের গলাও শোনা যেতে লাগল! তারপর একটা কুকুরের চিৎকার - ঘেউ ঘেউ, ঘেউ !

কুমার একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সানন্দে বলে, “এ যে আমার বাঘার গলা ? মানিকবাবু, আর ভয় নেই।রামহরি নিশ্চয়ই লোকজন নিয়ে আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। রামহরি, রামহরি! আমরা এখানে আছি। রামহরি!”–বলতে-বলতে সে আলোগুলোর দিকে ছুটে এগিয়ে গেল এবং বলা বাহুল্য যে, মানিকবাবুও কুমারের পিছনে পিছনে ছুটতে একটুও দেরি করলেন না।

কুমারের আন্দাজ মিথ্যা নয়। সকলের আগে আগে আসছে ঘেউ-ঘেউ করতে করতে বাঘা, তারপর একদল আস্কারি বা বন্দুকধারী রক্ষী । পোর্টার বা কুলির দল লণ্ঠন হাতে করে তাদের পথ দেখিয়ে আনছে।

কুমারকে দেখেই বাঘা বিপুল আনন্দে ছুটে এসে, পিছনের দুই পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের পা দুটো দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলে । রামহরিও মহা-আহ্লাদে বলে উঠল, "জয়, বাবা তারকনাথের জয়! এই যে কুমারবাবু, এই যে মানিকবাবু। কিন্তু আমার খোকাবাবু কোথায়?"

কুমার বিমর্ষমুখে বললে, "রামহরি, বিমল আর বেঁচে আছে কিনা জানি না।"

রামহরি ধপাস করে বসে পড়ে বললে, "অ্যাঃ! বল কী?" কুমার দু'চার কথায় তাদের বিপদের কথা বর্ণনা করলে।

রামহরি তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তাহলে আর এখানে দেরি করা নয়! হয়তো এখনো গেলে খোকাবাবুকে বাঁচাতে পারব।"

ভোরের আলো যখন গাছের সবুজ পাতায়-পাতায় শিশুর মতন খেলা করে বেড়াচ্ছে, কুমার ও তার দলবল তখন একটা ঢিপির মতন ছোট পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

সেই ছোট পাহাড়টার উপরে উঠতে তাদের মিনিট-তিনেকের বেশি লাগল না। তারপরেই কুমারের চোখে যে-ভীষণ দৃশ্য জেগে উঠল, আমরা আগের পরিচ্ছেদেই তা বর্ণনা করেছি। কুমার এবং আর সকলে কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল ......প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে, বাওয়ার গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রামু তখন মহাউৎসাহে বিমলের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে ব্যস্ত ।

আর অপেক্ষা করার সময় নেই। রক্ষীদলকে ইঙ্গিত করে কুমার নিজেও একটা বন্দুক নিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে লাগল।

মরা দেঁতো ফাঁসির দড়ি ধরে বিমলকে শূণ্যে টেনে তুলতে উদ্যত হল, সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে কুমারের, তারপর রক্ষীদের বন্দুক ঘনঘন অগ্নিবর্ষণ শুরু করলে।

দেখতে দেখতে শত্রুরা যে যেদিকে পারলে, প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলে, ঘটনাস্থলে রইল খালি বিমল আর জনকয়েক হত ও আহত জুলু আর কাফ্রি-জাতের লোক। কুমার ও রামহরি একছুটে নিচে নেমে গিয়ে বিমলের গলার বাঁধন খুলে দিলে।

বিমল হাসতে হাসতে বলল, "মানিকবাবুর কাকার অনুগ্রহে দিব্যি স্বর্গে যাচ্ছিলাম, তোমরা এসে আমার স্বর্গ-যাত্রায় বাধা দিলে কেন?"

পুরাতন ভৃত্য রামহরি ধমক দিয়ে বললে, "জ্যাঠামি করতে হবে না ঢের হয়েছে।"

কুমার বললে, "ওরা তোমাকে ফাঁসিতে লটকে দিচ্ছিল কেন বিমল?'

—"গুপ্তধনের ম্যাপ কোথায় আছে বলি নি বলে ।"

কুমার তৎক্ষণাৎ উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, "সর্বনাশ! তাঁবুতে এখন বেশি লোকজন তো নেই? ওরা যদি এখন গিয়ে ম্যাপের লোভে আবার আমাদের তাঁবু আক্রমণ করে?"

বিমল নিশ্চিন্তভাবেই বললে, "তাহলে তাঁবুতে তারা ম্যাপ খুঁজে পাবে না।"

–"খুঁজে পাবে না? "

— "না" -- বলেই বিমল বসে পড়ল এবং নিজের জুতোর গোড়ালির এক পাশ ধরে বিশেষ এক কায়দায় টান মারলে। অম্‌নি গোড়ালির খানিকটা বাইরে বেরিয়ে এল এবং ভিতর থেকে সে একখণ্ড কাগজ বার করে কুমারকে দেখালে।

কুমার সবিস্ময়ে বললে, "ও কী ব্যাপার?"

বিমল বললে, "ম্যাপ। আমি অর্ডার দিয়ে কৌশলে এই জুতো তৈরি করিয়েছি। আমার জুতোর গোড়ালির একপাশ ফাঁপা....গুপ্তধনের ম্যাপ ওর মধ্যেই পরম আরামে বিশ্রাম করে!"

রামহরি বললে, "ছি ছি, খোকাবাবু! ওটা তো তোমার কাছেই ছিল, তবু ওটা তাদের হাতে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা কর নি? তুচ্ছ গুপ্তধনের জন্যে --"

বিমল বাধা দিয়ে বললে, "না রামহরি, না! সে শয়তানদের তুমি চেনো না,—আমি ম্যাপখানা দিলেও তারা আমাকে রেহাই দিত না! তাই আমি প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করি নি, বুঝেছ?.....যাক ও-কথা। এখন তাঁবুতে ফেরা যাক। কাল সকালেই আমরা উজিজি যাত্রা করব।"

সিংহদমন গাটুলা

এই তো টাঙ্গানিকা হ্রদ। কিন্তু এ কি হ্রদ, না সমুদ্র?

চোখের সামনে আকাশের কোল জুড়ে থৈ-থৈ করছে শুধু জল,—কোথায় তার ওপার, আর কোথায় তার তল!

এপারে তীরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর শ্যাম বনানী এবং আকাশের নীল-মাখানো জল-আয়নায় নিজেদের ছায়া দেখে বনের গাছপালার যেন মনের আনন্দে মর্মর-গান গেয়ে উঠছে।

বিমল, কুমার, মানিকবাবু ও রামহরি হ্রদের ধারে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কারণ, যদিও মানিকবাবুর মেজো কাকার পত্রে তারা জেনেছিল যে, টাঙ্গানিকার চেয়ে লম্বা হ্রদ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই এবং স্থানে-স্থানে তা পঁয়তাল্লিশ মাইল চওড়া, তবু টাঙ্গানিকাকে স্বচক্ষে দেখবার আগে তারা এর বিপুলতার স্পষ্ট ধারণা করতে পারেনি।

বনের ভিতরে Mvule নামে এক জাতের গাছ দেখা গেল, তাদের বিপুলতা দেখলেও আশ্চর্য্য হতে হয় । তাদেরই গুঁড়ি কেটে নিয়ে এদেশি লোকেরা যে-সব নৌকা তৈরি করেছে, হ্রদের উপরে সেগুলি সারে-সারে নেচে-নেচে ভেসে যাচ্ছে। কূল দিয়ে একখানা বড় স্টিমারও হ্রদের বুক দুলিয়ে চলে গেল, কুমার দেখলে, স্টিমারে তার নাম লেখা রয়েছে, Hedwig von Wissmann!

কুমার বললে, “নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে, এখানা জার্মান স্টিমার।”

বিমল বললে, “হুঁ, উজিজি যখন মার্জনদের স্টেশন তখন এখানে তাদেরই স্টিমার থাকা স্বাভাবিক ।” তারপর পথ-প্রদর্শকের কাছ থেকে তারা জানতে পারলে যে, টাঙ্গানিকার পূর্ব তীরে মার্জনদের, দক্ষিণ তীরে ইংরেজদের ও পশ্চিম তীরে বেলজিয়ানদের প্রভুত্ব এবং তার জলে স্টিমারও ভাসে অনেকগুলো ।

উজিজি নামে যে বড় গ্রামখানি হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তা জার্মান স্টেশন হলেও দলে-দলে আরব এসে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে এবং সোয়াহিলি জাতের লোকেরাও এখানে দলে বেশ ভারি। সোয়াহিলি কথাটির সৃষ্টি হয়েছে সোয়া হিলি শব্দ থেকে। সোয়াহিলির (swahili) মানে হচ্ছে, "যারা শত্রু-মিত্র সবাইকে সমান ঠকায় !" চমৎকার নাম !

গ্রামের ঠিক বাইরেই, টাঙ্গানিকার তীরে বিমলদের তাঁবু পড়ল।

রামহরি আঁজ্‌লা করে টাঙ্গানিকার জল মুখে নিয়ে বললে, "ও খোকাবাবু, সমুদ্দুরের জলের মতন অতটা না হোক, এ-জলও যে বেশ একটু নোন্তা! এ-জল তো খেতে ভালো লাগে না ।"

বিমল বললে, "তাহলে খাবার জল অন্য জায়গা থেকে আনতে হবে। কিন্তু রামহরি, তোমাকে এখন অন্য কাজ করতে হবে । জনাকয়েক লোক নিয়ে একবার গাঁয়ের ভেতরে যাও। দেখে এস, এখানে হাট-বাজার কিছু আছে কিনা। আর গাটুলা বলে কোন বুড়ো সর্দার এই গাঁয়ে বাস করে কিনা, সে খোঁজটাও নিয়ে এস।"

রামহরি বললে, "গাটুলা? সে আবার কে?"

—"মানিকবাবুর মেজো কাকা সুরেনবাবুর চিঠিতে তার পরিচয় পেয়েছি। সুরেনবাবুর সঙ্গে গাটুলাও গুপ্তধন আনতে গিয়েছিল, আমারও তাকে সঙ্গে নেব। পথের খবর সে সব জানে ।"

রামহরি বললে, "পারি তো, গাটুলাকে তোমার কাছে নিয়ে আসব কি?"

– "হ্যাঁ।"

রামহরি চলে গেল। মানিকবাবু এগিয়ে এসে আস্তে-আস্তে বললেন, "বিমলবাবু আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

—"বলুন।"

—"আপনারা তাহলে গুপ্তধন না নিয়ে ফিরবেন না?"

—"এই রকমই তো আমাদের মনের ইচ্ছে!"

—"মেজো কাকার চিঠি পড়ে যা বুঝেছি, আমরা গুপ্তধন আনতে গেলে সেখানকার অসভ্য লোকদের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে অর্থাৎ এখন যে-সব বিপদের বোঝা আমাদের ঘাড়ের ওপরে চেপে রয়েছে, তার ওপরেও এই নতুন বিপদ নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে?"

– "হুঁ।"

—"মশাই, তাহলে আপনারাই গুপ্তধন আনতে যান। আমি লিখে দিচ্ছি, তার বখ্‌রা আমার চাই না!"

—"আপনি কী করবেন?"

—"দেশে যাব ।"

—"বেশ, আগে তো গুপ্তধনের সন্ধানে যাওয়া যাক, তারপর আপনার কথামতো কাজ করা যাবে - গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলে বিমল একটা গাছতলায় গিয়ে বসে পড়ল ।

মানিকবাবু খানিকক্ষণ নিরাশমুখে সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে, ফোঁস্, করে একটা দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন এবং এ-যাত্রা প্রাণটা নিতান্তই বাজে খরচ হবে বুঝে বিছানাকে আশ্রয় করে দুই চক্ষু মুদে ফেললেন।

হ্রদে খুব মাছ পাওয়া যায় শুনে কুমার মাছ ধরবার আয়োজন করবার জন্যে বেরিয়ে গেল ।

তাঁবু থেকে খানিক তফাতে একটা সঙ্গিহীন একানিয়া-গাছের উপরে চড়ে একটা বানর ভারি বিপদে পড়েছে। তাকে দেখেই সুযোগ বুঝে বাঘা সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে এবং থাবা পেতে গাছতলায় বসে এক দৃষ্টিতে বানরটার দিকে তাকিয়ে নীরব ভাষায় যেন বলছে,—আর তো পালাবার পথ নেই স্যাঙাত। কাজেই সুড় সুড় করে নেমে এসে দেখ, আমি কেমন চমৎকার কামড়ে দিতে শিখেছি!

ঘণ্টাখানেক পরে রামহরি একদল আরবের সঙ্গে ফিরে এল ।

আরবদের ভিতর থেকে একটা লোক দূর হতেই বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তার মুণ্ডটা প্রকাণ্ড এক ফুটবলের মত গোলাকার, তার বক্ষদেশ প্রকাণ্ড এক বৃক্ষের কাণ্ডের মতন চওড়া, তার ভুঁড়িটি প্রকাণ্ড এক পোঁটলার মতন, যেন কোমরে বাঁধা থেকে ঝুলছে ও দুলছে এবং তার প্রকাণ্ড পা দুটো পৃথিবীর উপর দিয়ে চলছে, আর মনে হচ্ছে, দু-দুখানা কোদাল যেন মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে এগিয়ে আসছে! এ লোকটার আগাগোড়া সমস্তই প্রকাণ্ড!

রামহরি এসে বললে, "খোকাবাবু, তুমি যাকে খুঁজেছিলে তাকে এনেছি!"

বিমল বললে, 'গাটুলা?"

সেই প্রকাণ্ড-মুণ্ড-বুক-ভুঁড়ি-পা-ওয়ালা লোকটি প্রকাণ্ড একটা হা করে হা-হা স্বরে হেসে বললে, "হ্যাঁ হুজুর! আমারই নাম গাটুলা-লোকে আমাকে সিংহদমন গাটুলা-সর্দার বলে ডাকে।আজ পর্যন্ত সতেরোটা সিংহকে আমি যমের বাড়ির রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি।"

বিমল বিস্মিত হয়ে বললে, "গাটুলা, তুমি বাংলা জানো?"

–"হ্যাঁ জানি বৈকি,-বাংলা জানি, ফার্সি জানি, ইংলিশ জানি, জার্মান জানি! আমি বাংলা শিখেছি সুরেনবাবু-হুজুরের - তার আত্মা স্বর্গবাস করুকু - কাছ থেকে।"

—"আমরাও সুরেনবাবুর চিঠিতেই তোমার পরিচয় পেয়েছি। সুরেনবাবুর ভাইপোর সঙ্গে আমরা বাংলাদেশ থেকে তোমার কাছেই এসেছি।"

গাটুলা আগ্রহভরে বললে, "কোথায় সুরেনবাবুর ভাইপো? আমি তাকে আলিঙ্গন করে ভালোবাসা জানাতে চাই।"

—"তিনি তাঁবুর ভেতরে বিশ্রাম করছেন, একটু পরেই তার সঙ্গে দেখা হবে।"

গাটুলা মাটির উপরে বসে পড়ে দুলতে দুলতে বললে, “হুঁ, আপনারা কেন এসেছেন, তা আমি জানি। আপনারা যে শীঘ্রই আমার কাছে আসবেন, তাও আমি কাল রাতেই টের পেয়েছিলাম।”

বিমল আশ্চর্য হয়ে বললে, “কাল রাতেই টের পেয়েছিলে? কেমন করে?”

—“শুনুন হুজুর, বলি। আমি বেশি কথার মানুষ নই, যা বলব দু-চার কথায় বলব। যারা বেশি কথা কয়, তারা বাজে কথা কয়। তারা সিঙ্গি মারতে পারে না। যারা সিঙ্গি মারতে পারে না, তারা বীরপুরুষ নয়। আর যারা বীরপুরুষ নয়, সিংহদমন গাটুলা সর্দার তাদের মুখে থুতু দেয়।”- এই বলে গাটুলা ভূমিতলে থু থু করে থুতু ফেললে।

মনে-মনে হেসে বিমল গম্ভীর মুখে বললে, “হ্যাঁ, তুমি যে বেশি কথার মানুষ নও, তোমার কথা শুনেই তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরা যে শীঘ্রই এখানে আসব, কাল রাতেই তুমি কেমন করে তা টের পেয়েছিলে?”

—সেই কথা জানতে চান তো শুনুন হুজুর, বলি। সাধু লোক রাত্রে ঘুমোয়। গাটুলা-সর্দার সাধু লোক, কাজেই অন্য রাত্রের মতো কাল রাত্রেও সে ঘুমোতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, ঘুমোলে অতি বড় জ্ঞানবান লোকও অজ্ঞান হয়ে যায়। কাজেই কে এক অসাধু ব্যক্তি কাল রাত্রে কখন যে আমাকে চুরি করতে এসেছিল, আমি তো মোটেই জানতে পারি নি।’

আশ্চর্য স্বরে বিমল বললে, “তোমাকে চুরি করতে এসেছিল? বল কী?”

—“হ্যাঁ হুজুর, হ্যাঁ। চোরের আস্পর্ধাটা বুঝুন একবার। আমি হলুম গিয়ে সিংহদমন গাটুলা-সর্দার, আমি কি মেয়েদের কানের মাকড়ি, নাকের নথ বা হাতের চুড়ি, যে বেমালুম আমাকে চুরি করে নিয়ে যাবে?.... কিন্তু হুজুর, এ বড় সোজা চোর নয় -হয় তো এ মানুষই নয়-”

বিমল বাধা দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, “অ্যাঁ, মানুষই নয়!

—"উহু, মানুষ তো নয়ই, তবে ভূত-প্রেত দৈত্য-দানো কিনা জানি না, তা, আচ্ছা হুজুর, ভূত-প্রেতের গায়ে কি লোম থাকে?"

–"তার গায়ে কি লোম ছিল?"

–"সে যখন আমাকে কোলে করে নিয়ে পালাচ্ছিল, তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে কারুকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল তার গায়ে হাত বুলিয়ে পেলুম খালি রাশি-রশি লোম!"

বিমল রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, "তারপর—তারপর?"

—"তারপর আর কী গাটুলা-সর্দারের সিংহগর্জন- সিংহের কাছ থেকেই আমি গর্জন করতে শিখেছি, -শুনে চারিদিক থেকে লোকজন এসে পড়ল, চোরটাও তখন আমাকে ফেলে অদৃশ্য হল!"

--"কেউ তাকে দেখতে পায় নি।"

--"না!"

—"কিন্তু আমরা যে আসব, সেটা তুমি জানলে কী করে?"

—"জানব না কেন? গাটুলা-সর্দার আজ পঁয়ষট্টি বছর এ-অঞ্চলে বিচরণ করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললে, কিন্তু তাকে চুরি করতে পারে এমন মানুষ সে দেখে নি । আর, তাকে চুরি করে লাভ? তাকে চুরি করবেই বা কেন? নিশ্চয় গুপ্তধনের লোভে । সম্রাট লেনানার গুপ্তধনের ভাণ্ডার কোথায়, আমার তা জানা আছে। আর এ-কথা এখন জানেন কেবল সুরেনবাবুর ভাই আর ভাইপো । কাজেই আমি আন্দাজে বুঝেছিলাম যে, এ-অঞ্চলে হয়তো আপনাদের কারুর না-কারুর শুভাগমন হয়েছে।....কিন্তু হুঁশিয়ার।" এই বলে চিৎকার করেই গাটুলা বিদ্যুৎবেগে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল এবং পরমুহূর্তে দেখা গেল তার দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির ভেতরে এক সুদীর্ঘ ও সুতীক্ষ্ণ বর্শার আবির্ভাব হয়েছে। এ যেন এক ভেল্কিবাজি!

রামহরি বললে, “খোকাবাবু, এ-বর্শা তোমাকে টিপ করে ছোঁড়া হয়েছে! কিন্তু, কে এটা ছুঁড়লে!”

বিমল বললে, “যেই ছুঁড়ুক কিন্তু গাটুলা-সর্দার বর্শাটাকে ধরে না ফেললে এতক্ষণে আমাকে মাটিতে লোটাতে হত।.....নিশ্চয় এ বিষাক্ত বর্শা। সর্দার, তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে । এ-কথা আমি ভুলব না।”

গাটুলা একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, “আরে--আরে, শীগ্‌গির গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ান, দেখছেন না, আরো বর্শা আসছে?”

আরো পাচ-ছয়টা বর্শা বিদ্যুৎশিখার মতন এদিক-ওদিক দিয়ে সাঁৎ-সাঁৎ করে চলে গেল,—সকলে তাড়াতাড়ি একটা প্রকাণ্ড গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল। নিজের হাতের বর্শাটাকে ক্ষণকাল পরীক্ষা করে গাটুলা বললে, ‘ওয়া-কিকুউ জাতের যোদ্ধারাই এরকম বর্শা ব্যবহার করে! কিন্তু তারা আমাদের আক্রমণ করলে কেন?”

যক্ষপুরীর কথা

বিমল বললে, “সর্দার, ওয়া-কিকুউ কাদের বলে?”

গাটুলা বললে, “তারা অসভ্য জাতের লোক, কেনিয়া জেলার কেডং নদীর ধারে তাদের বাস । তারা লড়াই করতে খুব ভালোবাসে, আর ভারি নিষ্ঠুর। কিন্তু তারা এমুল্লুকে এল কেন, আর আমাদেরই বা আক্রমণ করলে কেন, এটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। আমি হলুম গিয়ে সিংহদমন গাটুলা-সর্দার, আমাকেও তারা ধাঁধায় ফেললে দেখছি!”

বিমল বললে, “কোন ভাবনা নেই সর্দার, তোমার ধাঁধার জবাব এখুনি পাবে -বলেই সে পকেট থেকে একটা ছোট বাঁশি বার করে খুব জোরে বাজালে।

পর-মুহূর্তেই তাঁবুর ভিতর থেকে আস্কারি অর্থাৎ সশস্ত্র রক্ষীর দল বেগে বেরিয়ে এল।

বিমল হুকুম দিলে, “ঐ জঙ্গলের ভিতর থেকে আমাদের লক্ষ করে কারা বর্শা ছুড়ছে। তাদের তাড়িয়ে দাও, আর পারো তো তাদের এখানে ধরে নিয়ে এস।”

রক্ষীর দল বন্দুক কাঁধে করে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে জঙ্গলের দিকে ছুটল।

গাটুলা বললে, “বা,-সাহেব, বা আপনারা লোকজন নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে এসেছেন দেখছি । তাহলে গুপ্তধন না নিয়ে আর ফিরবেন না?”

বিমল বললে, “এই রকম তো আমাদের মনের ইচ্ছে। আর এই জন্যেই তো আমরা তোমার সাহায্য চাই।”

গাটুলা বললে, “সুরেনবাবু-হুজুরের ভাইপো যখন আপনাদের দলে, তখন গাটুলা-সর্দার আপনাদের গোলাম হয়ে থাকবে । কিন্তু সম্রাট লেনানার গুপ্তধন তো ছেলের হাতের মোয়া নয়, যে আব্দার ধরলেই পাওয়া যাবে? যার প্রাণের মায়া আছে, সেখানে সে যেতে পারে না ।”

বিমল বললে, “আমরা হাসতে-হাসতে প্রাণ দিতেও পারি, নিতেও পারি সর্দার! কিন্তু একটা প্রাণ দেবার আগে দশটা প্রাণ নিয়ে মরব, এটা তুমি জেনে রেখ।”

গাটুলা বললে, “সাবাস বাবু-সাহেব! আপনার কথা শুনে সিংহ-দমন গাটুলা-সর্দার পরম তুষ্ট হল । কিন্তু-”

এমন সময় রক্ষীরা ফিরে এসে খবর দিলে, জঙ্গলের ভিতর কারুকে দেখতে পাওয়া গেল না ।

বিমল বললে, “তাহলে তারা পালিয়েছে আচ্ছা, তোমরা যাও।” তারপর গাটুলার দিকে ফিরে বললে, “কিন্তু কি বলছিলে সর্দার?”

গাটুলা বললে, “কিন্তু হুজুর, সম্রাট লেনানার গুপ্তধন যেখানে আছে, সেখানে মানুষ যেতে পারে না।”

বিমল বললে, “তুমি কী বলছ সর্দার, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সে গুপ্তধন কি শূন্যে আছে, না পাতালে আছে, যে, মানুষ সেখানে যেতে পারবে না?”

গাটুলা বললে, “হুজুর, এখন তো আকাশেও মানুষ যাচ্ছে, পাতালেও মানুষ যাচ্ছে; সুতরাং আকাশ-পাতালের কথা কী বলছেন? আকশে কি পাতালে এ-গুপ্তধন থাকলে এতদিনে মানুষ নিশ্চয়ই তা লুটে আনত,–কিন্তু এ আকাশও নয়, আর পাতালও নয়, আর সেইটেই তো হচ্ছে দুঃখের কথা ।”

বিমল কিঞ্চিৎ অধীর-স্বরে বললে, “সর্দার, তুমি ত' বেশি কথার মানুষও নও, যা বলতে চাও, অল্প কথায় গুছিয়ে বল।"

“সম্রাট লেনানার সে গুপ্তধন হচ্ছে, যখের ধন।"

–“যখের ধন?”

—“হ্যাঁ হুজুর, যখের ধন। কিন্তু এ এক-আধ জন যখ নয়, —হাজার - দু'হাজার যখ!”

—“কী তুমি বলছ, গাটুলা?”

গাটুলা তার ভয় মাখানো দৃষ্টি দূরে -- বহু দূরে স্থাপন করে, কেমন যেন আচ্ছন্নভাবে বললে, “হাজার-দু'হাজার যখ-কতকাল, কত যুগ আগে থেকে কাবাগো-পাহাড়ের বিপুল সেই অন্ধকার গুহার ভেতরে বসে-বসে এই গুপ্তধনের উপরে কড়া পাহারা দিয়ে আসছে, তার ঠিক হিসেব কেউ জানে না ! মানুষ তো ছার, বোধকরি দেবতা-দানবও সেখানে পা বাড়াতে ভরসা পায় না। তার ভেতরে তো দূরের কথা, কোন মানুষ তার আশ-পাশ দিয়েও হাঁটতে চায় না!....কতবার কত লোক গুপ্তধনের লোভে সেখানে গিয়েছে কিন্তু যারা গিয়েছে, তারা গিয়েছেই, প্রাণ নিয়ে তাদের কেউ আর ফিরে আসে নি! এই তিরিশ বছর আগেই আট-দশ জন সায়েব অনেক তোড়জোড় করে গুপ্তধন আনতে গিয়েছিল। শোনা যায়, গুপ্তধনের সন্ধানও তারা পেয়েছিল। কিন্তু ঐ-পর্যন্ত। তারপর যে তাদের কী হল, কর্পূরের মতন তারা যে কোথায় উবে গেল কেউ তা বলতে পারে না। কেবল একজন সায়েবকে ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে ফিরে আসতে দেখা গিয়েছিল কিন্তু পাগল অবস্থায়।

.....যুগ যুগ ধরে এই যে শত-শত লোভী মানুষ গুপ্তধন আনতে গিয়ে প্রাণ খুইয়েছে, গুহার বাইরে, চারিদিকের নিবিড় অরণ্যে-অরণ্যে, আজও তাদের অশান্ত আত্মা নাকি হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায় প্রতি রাত্রে নাকি তাদের অমানুষিক কান্না শুনে বাঘ-সিঙ্গিরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গর্জন ভুলে যায়--”

বিমলের পাশ থেকে হঠাৎ বলে উঠল, “বাবা, বল কী!”

বিমল ফিরে দেখে বললে, “এই যে, মানিকবাবু যে! আপনি কখন এলেন এখানে?” —“আমি কখন এসেছি, আপনারা দেখতে পান নি, গল্প শুনতেই মত্ত হয়ে আছেন ...কিন্তু এ-লোকটি কে? এ যা বলেছে, তা কি সত্যি? সত্যি হলে তো ভারি সমস্যার বিষয়!"

–“কিছুই সমস্যার বিষয় নয়। কারণ আমি ভূত মানি না। আর যখের নাম শুনলেও ভয় পাবার ছেলে আমি নই।”

–“কিন্তু বিমলবাবু, আমি ভূতও মানি, যখেও বিশ্বাস করি।”

—“তাতে আমার কিছু এসে যায় না।”

—“কিন্তু আমার বিলক্ষণই এসে যায়। গুপ্তধনের লোভে ভূত-প্রেতের হাতে প্রাণ খোয়াতে আমি রাজি নই।"

—“কিন্তু মানিকবাবু, সে-সমস্যার সমাধান তো আমি আগেই করে দিয়েছি। আপনার যদি ইচ্ছে না থাকে, আপনি তো অনায়াসেই দেশে চলে যেতে পারেন।”

—“ধন্যবাদ। কথাটা আপনি যত সহজে বলছেন, কাজে সেটা ততটা সহজ হবে না বোধহয় । এ তো মামার বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যাওয়া নয়, এ সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশে যাওয়া । তার ওপর বনের বাঘ-সিঙ্গির কথা ছেড়ে দি, পথে যদি ঘটোৎকচের দলের সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যায়, তাহলে -- বাপ্‌রে--”

–“হু, তাহলে ব্যাপারটা যা দাঁড়াবে, আন্দাজেই আমি সেটা বুঝতে পারছি। সুতরাং বেশি আর গোল করবেন না, সুড়-সুড় করে লক্ষ্মী ছেলেটির মতন আমাদের সঙ্গে চলুন।"

মানিকবাবু কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন, “হা অদৃষ্ট, আমার কপালে শেষটা এই ছিলো গা! সিঙ্গির মুখে থেকেও বেঁচে ফিরেছি, কিন্তু এবারে ভূতের হাতে পড়েই আমার বুঝি দফা রফা হল!”

রামহরি এতক্ষণ চুপ কর বসে শুনছিল। এতক্ষণে সে-ও এগিয়ে এসে বললে, “খোকাবাবু, মানিকবাবু ঠিক কথাই বলেছেন, আর এ নতুন বিপদের ভেতরে তুমি যেয়ো না, লক্ষ্মীটি।”

গাটুলা মানিকবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, “এ ভদরলোকটি কে, হুজুর?”

বিমল বললে, “ইনিই তোমার সেই সুরেনবাবুর ভাইপো ।”

গাটুলা প্রকাণ্ড মুখে প্রকাণ্ড একটা হা করে সবিস্ময়ে বললে, “সুরেনবাবু-হুজুরের ভাইপো অমন সাহসী লোকের এমন ভীতু ভাইপো! আমি বিশ্বাস করি না।”

বিমল বললে, “না সর্দার, বাঙালি কখনো ভীতু হয় না। মানিকবাবুও ভীতু নন, তবে দেশের জন্যে ওঁর মন কেমন করছে বলেই উনি এমনি সব নানা মিথ্যে ওজর তুলছেন।”

গাটুলা বললে, “ও, বুঝেছি! আমারও অমন হয়। আমি হলুম গিয়ে সিংহদমন গাটুলা-সর্দার, কিন্তু বিদেশ-বিভুঁয়ে গেলে বলব কি হুজুর, বৌ-এর জন্যে আমারও মন কেমন করে। এই বলেই সে তার প্রকাণ্ড হাত দুখানা দিয়ে মানিকবাবুকে নিজের বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বললে, “আপনি হচ্ছেন আমার প্রভু সুরেনবাবু-হুজুরের - তার আত্মা স্বর্গলাভ করুক – ভাইপো ! আসুন, আপনাকে আমি আলিঙ্গন করি।”

বিমল বসে ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “তাহলে গাটুলা সর্দার, আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার কোন আপত্তি হবে না, বোধহয় ? যে-সব বিপদ-আপদের কথা বললে, আমি বাঙালির ছেলে, সে-সব বিপদ-আপদকে আমি একটুও গ্রাহ্য করি না। বিপদকে আমি ভালবাসি, ছুটে গিয়ে বিপদের ভেতরে আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই। বিপদের কথা নিয়ে যারা বেশি মাথা ঘামায়, বিপদ আগে আক্রমণ করে তাদেরই !’

গাটুলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, “সাবাস, সাবাস! এই তো মরদকা বাত্! আমি সাহসীর গোলাম, আপনারা যেখানে যাবেন, আমি সেইখানেই আপনাদের সঙ্গে যাব।”

বিমল বললে, “তাহলে কালকেই আমরা কাবাগো-পাহাড়ের দিকে যাত্রা করব। ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, যে যেখানে আছে সকলকেই আমি আমন্ত্রণ করছি, তারা পারে তো আমাদের বাধা দিয়ে দেখুক।”

মানিকবাবু ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, “ও বাবা বলেন কী!”

যক্ষপুরীর রক্ষী

চলেছে সকলে দল বেঁধে যক্ষপুরীর দিকে যেখানে যুগ-যুগান্তরের গুপ্তধন ভাগ্যবানের জন্যে অপেক্ষা করছে, যেখানে হাজার-হাজার যক্ষ সেই ধন-রত্নের উপরে বুক পেতে বসে আছে, যেখানে শত-শত অভিশপ্ত অশান্ত আত্মা উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আকাশ-বাতাসকে কাতর করে তুলেছে।

টাঙ্গানিকা হ্রদের ধার দিয়ে বিমলদের এই মস্ত দলটি কোলাহল করতে-করতে অগ্রসর হচ্ছে! সর্বাগ্রে চলছে গাটুলা-সর্দারের নিজের লোকজন,–গুণতিতে তারা পঁচাত্তরের কম নয়! তারপর যাচ্ছে বিমলদের দল, সংখ্যায় তারাও একশো-চবিবশ জন। আস্কারি বা বন্দুকধারী রক্ষীরা দলের চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে, কারণ কখন কোনদিক থেকে কে এসে হাজির হয় কেউ তা বলতে পারে না। আস্কারি ছাড়া অন্য সকলের কাছে বন্দুক নেই বটে, কিন্তু দলের সামান্য কুলিরা পর্যন্ত সশস্ত্র,–কারুর কাছে খালি বর্শা, কারুর কাছে বর্শা ও তীর-ধনুক দুই-ই। এ হচ্ছে আফ্রিকার বনপথ, এখানে অস্ত্র ছাড়া, কেউ এক পা হাঁটতে ভরসা করে না ।

মাঝে-মাঝে পাহাড়, মাঝে-মাঝে অরণ্য এবং মাঝে-মাঝে ধান, আখ, আলু বা অন্যান্য শাক-সব্জি ও শস্যের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে । মাঝে-মাঝে এক-একটা নদী এসে টাঙ্গানিকার বিপুল বুকের ভিতরে হারিয়ে যাচ্ছে। সে-সব জায়গায় আকাশে উড়ে পালাচ্ছে জল-মুর্গির দল এবং জলে খেলা করছে কিম্ভূতকিমাকার হিপোপটেমাসের দল আর ডাঙা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মস্‌ত-মস্ত কুমির!

কিন্তু বন, পাহাড়, নদী ও শস্যক্ষেত পেরিয়ে অশ্রান্ত দেহে চলেছে এই দুই শতাধিক মনুষ্য,–পথের নেশা আজ যেন তাদের মনকে মাতিয়ে তুলেছে এবং

কোথায় গিয়ে যে তাদের নেশার ঘোর কাটবে, দলের সেরা-সেরা দু-চারজন লোক ছাড়া আর কেউ তা জানে না ।

দলের ভিতরে সব চেয়ে বেশি ফাঁপরে পড়েছেন বেচারা মানিকবাবু। তার আরামের শরীর, কলকাতায় থাকতে মোটর ছাড়া তিনি এক পাও চলতে পারতেন না, আর হাঁটতে-হাঁটতে আজ তার ননীর দেহের দুর্গতির সীমা নেই! মাঝে-মাঝে ও বাবা, গেলুম যে, বলে তিনি ধপাস করে বসে পড়ে হাঁপরের মতন হাঁপাতে থাকেন, কিন্তু হায় রে, আশ মিটিয়ে বেশিক্ষণ কি হাঁপাবারও যো আছে ? দলের লোকগুলো এমন নিষ্ঠুর যে, তার মুখ চেয়ে কেউই একটুও অপেক্ষা করতে রাজি হয় না! কাজেই দলছাড়া হবার ভয়ে আবার তাকে উঠে হাঁসফাঁস করতে-করতে ছুটতে হয়। মনের ব্যথা কারুর কাছে প্রকাশ করেও লাভ নেই, কারণ তার কথা শুনে বিমল ও কুমার খালি হা-হা করে হাসতে থাকে!

তবে টাঙ্গানিকার জলে যে-সব মাছ ও নদীর মুখে-মুখে যে-সব জল-মুর্গি পাওয়া যাচ্ছে, তাদের মাংস যে অতীব উপাদেয়, এত দুঃখেও মানিকবাবুকে হাসিমুখে সে-কথা বারবার স্বীকার করতে হচ্ছে।

সেদিন তিনটে জল-মুর্গির রোষ্ট উদরস্থ করে মানিকবাবু প্রসন্ন মুখে ঢেঁকুর তুলতে-তুলতে বললেন, “হ্যাঁ, এ-পৃথিবীতে নিছক দুঃখ বলে যে কিছুই নেই, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি।”

কুমার বললে, “এত-বড় সত্যি কথাটা ফস্, করে বুঝে ফেললেন কেমন করে মানিকবাবু?”

মানিকবাবু ভুঁড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, “ও বাবা, তা আর বুঝব না? এই হাড়ভাঙা হাঁটুনিতে আর খাটুনিতে এতদিনে নিশ্চয়ই আমি অক্কা লাভ করতুম, কিন্তু বেঁচে আছি এই চপ, কাটলেট, রোস্টের জোরে । এমনি পেট-ভরা খানা যদি রোজ জোটে--”

—"তাহলে কাবাগো-পাহাড়ের ভূতের দলও আপনার কিছুই করতে পারবে না, কেমন মানিকবাবু, আপনি এই কথাটি বলতে চান তো?"

মানিকবাবু অমনি মুখ ম্লান করে বললেন, "ঐ তো, ঐ তো আপনাদের দোষ। সুখের সময়ে ও-সব ভূত-প্রেতের কথা মনে করিয়ে দেন কেন, বদহজম হবে যে!"

—"যাদের নামেই আপনার বদহজম হয়, তাদের কাছে গেলে আপনি কি করবেন?"

—"ও বাবা, বলেন কী! আমি যাব তাদের কাছে? আমার বয়ে গেছে। পাতে দু-চারখানা কাটলেট-টাটলেট দিয়ে আপনারা যদি আমাকে আড়ালে কোন নিরাপদ জায়গায় বসিয়ে রাখেন, তাহলেই আমি খুশি থাকব। ভূত-প্রেতের সঙ্গে আলাপ করবার সখ আমার মোটেই নেই।"

কাবাগো-পাহাড়ের কালো চুড়ো দেখা গেল, সন্ধ্যা তখন হয় হয়!

সূর্য অস্ত যাবার পরেই পশ্চিম আকাশের রক্তাক্ত বুকের উপরে নিবিড় কাজলের প্রলেপের মতন একখানা প্রকাণ্ড মেঘের কালো আবরণ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল।

গাটুলা বললে, "বিমলবাবু, এইবারে আপনারা এমন একটা দৃশ্য দেখবেন, জীবনে যা কখনও দেখেন নি। টাঙ্গানিকার ওপরে মেঘের খেলা দেখলে সায়েবরা ভারি সুখ্যাতি করে। আমি সিংহদমন গাটুলা সর্দার, আমিও বলছি, সত্যিই সে এক আশ্চর্য দৃশ্ !"

বিমল বললে, "কিন্তু গাটুলা, ঝড়-বৃষ্টি আসবার আগেই আমাদের ছাউনি পাততে হবে যে!"

গাটুলা বললে, “আমি হলুম গিয়ে সিংহদমন গাটুলা-সর্দার, আমার কাজে আজ পর্যন্ত কেউ খুঁৎ ধরতে পারেনি। ছাউনি পাতবার ব্যবস্থা না করেই কি মেঘের খেলা দেখে আশ্চর্য হতে এসেছি।"

ঘন-ঘন-বিদ্যুৎ-ভরা মেঘখানা ক্রমেই এগিয়ে আসছে আর মনে হচ্ছে একটা বিরাট কৃষ্ণ দৈত্য যেন অগ্নিময় দন্তবিকাশ করতে করতে সারা আকাশকে গিলে ফেলতে চাইছে! .....অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত আকাশ মেঘে পড়ে গেল, টাঙ্গানিকার নীলিমা দেখতে-দেখতে কালিমায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। গুরুগুরু বাজের আওয়াজে সৃষ্টির আর সব শব্দ যেন বোবা হয়ে পড়ল এবং বাজের ডাক শুনে যেই ঝড়ের ঘুম ভাঙল, আমনি অরণ্যের যত গাছপালা পাগল হয়ে তাণ্ডব নাচ শুরু করে দিলে ।

অশান্ত টাঙ্গানিকার জলে সে কী তোলপাড়! পাতাল কারাগারের ভিতর থেকে যেন কোন অতিকায় দানব জলের ঢাকা ঠেলে উপরে উঠতে চায়।

মেঘের পটে বিদ্যুৎ-লতার ডালাপালাগুলো থেকে-থেকে চোখ ধাঁধিয়ে দেখা দিচ্ছে আর মনে হচ্ছে, তারা কোন অশরীরীর অদৃশ্য দেহের জ্বলন্ত সব শিরা উপশিরা।

গাটুলা ঠিক বলেছে, মেঘের যে এমন ঘনকাজল রঙ হতে পারে, বিদ্যুতের তীব্র খেলা যে এত দ্রুত হতে পারে এবং বজ্রের গর্জন যে এত ভীষণ ও উচ্চ হতে পারে, বিমল বা কুমার আগে তা জানত না। কিন্তু এ ভয়াবহ সৌন্দর্য তারা বেশিক্ষণ উপভোগ করতে পারলে না, বিষম ঝড়ের ঝাপটায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে তারা বনের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের তলায় যেখানে ছাউনি পাতা হয়েছে, সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হল।

ঘন্টাখানেক পরে ঝড় থামল, বৃষ্টি শুরু হল। তাবুর ভিতরে তখন পরামর্শ-সভা বসেছে। বিমল বলছিল, “এই তো আমরা কাবাগো-পাহাড়ের কাছে এসে পৌছেছি। এখন—”

বাধা দিয়ে গাটুলা বললে, "আমরা কাবাগো-পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছি বটে, কিন্তু গুপ্তধন যত তফাতে ছিল, ঠিক তত তফাতেই আছে!"

-"তার মানে?"

—"তার মানে হচ্ছে, কাবাগো-পাহাড়ে উঠতে গেলেই গুপ্তধনের রক্ষীরা আমাদের আক্রমণ করবে। কোন বিদেশির সে পাহাড়ে ওঠবার অধিকার নেই, কারণ, সে হচ্ছে পবিত্র পাহাড়।"

—"এই রক্ষীরা কোন জাতের লোক?"

—"তাদের দেহে জুলু-রক্ত আছে বটে, কিন্তু তারা খাটি জুলু নয়।"

-"তারা কি দলে বেশ ভারি?"

—"তা হাজার-দুয়েক হবে। তবে ভরসা এই, তাদের অস্ত্র কেবল ঢাল, তরোয়াল, বর্শা, যুদ্ধ-কুঠার আর তীর-ধনুক । তাদের দলে দুএকটার বেশি বন্দুক নেই, তাও সেকেলে বন্দুক ।"

—"এ খুব ভালো কথা। তোমার আর আমাদের দলে বন্দুক আছে চল্লিশটা। তবে আর ভয় কিসের ?"

—"তারা যদি পাহাড়ের আড়াল থেকে তীর আর বর্শা ছোড়ে, তাহলে কী করবেন ?"

—"তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।"

--মানলুম। কিন্তু রক্ষীদের হাত থেকে পার পেলেও রক্ষে নেই, তারপর আছে যক্ষের দল, তারা পাহারা দেয় গুহার ভিতরে। সেই গুহাকে খালি গুহা বললে ভুল হবে, সে হচ্ছে প্রকাণ্ড এক গুহা-নগর । সে গুহা-নগরে কি আছে আর কি নেই আমি তা জানি না, কেউ তা জানে না । আমি সেই গুহা-নগরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছি। গুহার রক্ষীরাও ভিতরে ঢুকতে পায় না, ঢুকতে সাহসও করে না। কারণ ভিতরে আছে যক্ষের দল!"

বিমল অধীর স্বরে বললো, “সর্দার, আমি বার-বার বলছি, ও সব যখ-টক আমি বিশ্বাস করি না, সুতরাং ও সব বাজে কথা শুনতেও আমি রাজি নই। আজ তুমি বিশ্রাম কর-গে যাও, কাল সকালে আমরা কাবাগো-পাহাড়ে গিয়ে উঠব,–কারুর বাধা মানব না!’

গাটুলা-সর্দার আর কোন কথা না বলে বাইরে গেল ।

রাত্রে হঠাৎ বিমলের ঘুম ভেঙে গেল- তার গা ধরে কে নাড়া দিচ্ছে।

চোখ মেলে দেখে, একটা লণ্ঠন হাতে করে গাটুলা-সর্দার তার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

—“কী ব্যাপার সর্দার? এমন সময়ে ডাকাডাকি কেন?”

—“একবার বাইরে আসুন ।”

বিমল বিছানা ছেড়ে গাটুলার সঙ্গে তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার রাত। তখনো অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়ছে ও মাঝে-মাঝে বাজ ডাকছে।

গাটুলা বললে, “কিছু শুনতে পাচ্ছেন?”

—“হ্যাঁ, বাজ ডাকছে!”

—“বাজ নয়, বাজ নয়! ভালো করে শুনুন ।”

বিমল কান-পেতে শুনতে লাগল। দূরে,—খুব দূরে যেন কিসের শব্দ হচ্ছে।

—“হু, একটা শব্দ শুনছি বটে। ও কিসের শব্দ, সর্দার?”

–“অসংখ্য ঢাক-ঢোলের আওয়াজ।”

—“ঢাক-ঢোল! এই নিবিড় বনে ঢাক-ঢোল বাজায় কারা?”

—“কাবাগো-পাহাড়ের রক্ষীরা । তারা যুদ্ধের বাজনা বাজাচ্ছে।”

--“কেন?”

—“যুদ্ধের বাজনা বাজাতে-বাজাতে তারা আমাদের দিকেই আসছে। তারা নিশ্চয়ই খবর পেয়েছে যে, গুপ্তধনের ভাণ্ডার লুঠ করবার জন্যে আমরা এখানে এসে হাজির হয়েছি।”

দূরের ঢাকের আওয়াজ ধীরে-ধীরে বেড়ে উঠতে লাগল,—ক্রমে আরো, আরো স্পষ্ট ।

দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দুম্। যেন চার-পাঁচশো ঢাক-ঢোল বাজাতে-বাজাতে তালে-তালে পা ফেলে এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে।

দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দুম্। ক্রমে সেই সঙ্গে একটা অস্পষ্ট কোলাহলও শোনা গেল। খানিক পরে বোঝা গেল, তা কোলাহল নয় বহু কণ্ঠের সঙ্গীত! যেন হাজার-হাজার কণ্ঠ দামামার তালে-তালে সুগম্ভীর যুদ্ধসঙ্গীত বা জাতীয় সঙ্গীত গাইছে।

দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ ! ঢাক-ঢোলের শব্দে আর একতান-সঙ্গীতের ক্রমে সারা বনভূমি গম্ গম্ করতে লাগল। তারপর আবার আর-এক শব্দ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্! সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বুক যেন কাঁপতে লাগল ঢিপ্-ঢিপ্ ঢিপ্-ঢিপ্ ঢিপ্-ঢিপ্ ঢিপ্-ঢিপ্! মাটির উপরে তালে-তালে পড়ছে হাজার হাজার সৈনিকের পা!

গাটুলা হাসতে-হাসতে বললে, “এখন বুঝছেন বিমলবাবু, গুপ্তধনের আশ কত-বড় দুরাশা?”

বিমল চুপ করে দেখতে লাগল, অন্ধকারে আবছায়ার মতো দলে দলে হাতি, গণ্ডার, হিপো, সিংহ, হায়েনা, হরিণ, জিরাফ ও শৃগালেরা উদ্‌ভ্রান্তের মত চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছে। বনের ভেতরে কত-বড় বিরাট বাহিনী দেখে যে তারা একটা ভয় পেয়েছে, সে-কথা বুঝতে বিমলেরও বিলম্ব হল না!

তারপরে বন-জঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে অনেক দূরে দেখা গেল চার-পাঁচশো মশালের আলো ।

গাটুলা গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "বিমলবাবু, এখনো প্রাণ নিয়ে পালাবার সময় আছে!"

বিমল প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে গাটুলার দিকে তাকিয়ে বললে, "বাঙালির ছেলে প্রাণ নিয়ে পালাতে শেখে নি, সর্দার ! আমরা যুদ্ধ করব!"

গাটুলা বিমলকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, "বাহাদুর মরদের বাচ্চা, তোমার সঙ্গে মরেও আমোদ পাওয়া যবে!"

বিমল বিপদ জানাবার জন্যে বাঁশি বার করে খুব জোরে ফুঁ দিলে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁবুর ভেতরে দুশে লোকের ঘুম ভেঙে গেল।

ভূঁইফোঁড়

বিপদ

ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ পা পড়ে মাটির উপরে তালে-তালে,—আর ঢিপ্-ঢিপ্ ঢিপ্-ঢিপ্ ঢিপ্-ঢিপ্ ঢিপ্-ঢিপ্ কাঁপতে থাকে পৃথিবীর বুক। আর সঙ্গে-সঙ্গে বেজে ওঠে শত-শত ঢাকের বাদ্যি!

বিমলের সঙ্গের দুই শত লোক বিছানার ওপরে সচকিতে জেগে বসে দুরু-দুরু প্রাণে কান পেতে শুনতে লাগল, সেই দুই হাজার অসভ্য বন্য-সৈনিকের চার হাজার পায়ের শব্দ ও চার-পাঁচশোর ঢাক ঢোলের বিষম গণ্ডগোল ।

আবার বিমলের বাঁশি বেজে উঠল। দুই শত লোক তাড়াতাড়ি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল!

শত্রুদের অসংখ্য মশালের সামনে থেকে অরণ্যের নিবিড় অন্ধকার ক্রমেই পিছু হটে আসতে লাগল।

খুব চিৎকার করে বিমল বললে, “কেউ আলো জ্বেল না! বন জঙ্গলের আড়ালে গা ঢেকে সবাই ছড়িয়ে পড়ে দাঁড়াও! প্রত্যেক দু-তিনজন লোকের পরে এক একজন করে বন্দুকধারী আস্কারি থাক্ আর গাটুলা-সর্দার, তুমি দেখ আমার হুকুম মত কাজ করা হয় কীনা।

দূরে-দূরে বনের আলোকিত অংশে দলে-দলে কালো-কালো প্রায় ল্যাংটো মূর্তি দেখা গেল। তাদের হাতের চকচকে বর্শা ও তরোয়াল প্রভৃতি অস্ত্র ক্রমাগত বিদ্যুৎ সৃষ্টি করছে! মূর্তির পর মূর্তির সারি- শত্রু দলের যেন অন্ত নেই! তারা ঢোল বাজাচ্ছে আর নৃত্য করছে, প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে আর গান গাইছে। সারা পৃথিবীর শ্মশান-মশানকে ভূতশূণ্য করে আজ যেন সমস্ত ভূত এই জঙ্গলে এসে একজোট হয়েছে।

গাটুলা একদৃষ্টিতে শত্রুদের দিকে তাকিয়ে একমনে কি ভাবছিল। বিমল তার গা ধরে নাড়া দিয়ে বললে, “সর্দার, এখন আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই,—যা বললুম কর।”

গাটুলা সহাস্যে বললে, “বিমলবাবু, তুমি তাহলে সত্যিই যুদ্ধ করবে?”

বিমল বললে, “যুদ্ধ করব না তা কী করব? এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মরতেও পারব না, আর কাপুরুষের মতন পালাতেও পারব না।”

গাটুলা বললে, “আচ্ছা, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, আর আমি কী করি দেখ! এই বলে সে ফিরে দাঁড়িয়ে হুকুম দিলে, “বন্ধুগণ! তোমরা তাড়াতাড়ি তাঁবু তুলে জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নাও। তারপর আলোগুলো জ্বেলে ফেলো। তারপর খুব চিৎকার করতে-করতে যে-দিক দিয়ে আমরা এসেছি সেইদিকেই ছুটতে শুরু কর।”

বিমল বললে, “সর্দার, সর্দার! এ তুমি কী বলছ? আমরা পালাবার জন্যে এতদূর আসিনি।”

গাটুলা কঠিন স্বরে বললে, “বিমলবাবু, চুপ কর, আমাকে বাধা দিও না!...খামিসি, খামিসি।”

একজন আরবি-লোক ছুটে গাটুলার সামনে এসে দাঁড়াল। গাটুলা বললে, “খামিসি, তুমি আমার ডান হাত, সিংহদমন গাটুলা-সর্দারের কথা মতো কাজ করতে তুমি পারবে। এই সমস্ত লোকের ভার আমি তোমাকেই দিলুম।”

এদের দিয়ে খুব শোরগোল করতে করতে তুমি পিছিয়ে পড় আর মাঝে মাঝা বন্দুক ছোঁড়ো কিন্তু খবরদার, দাঁড়িয়ে কোথাও লড়াই করো না। হিপো-নদীর ধারে সেই যে গুপ্তস্থান, তার কথা তুমিও জানো । একেবারে সদলবলে সেইখানে গিয়ে হাজির হও,— সেখানে গেলে শত্রুরা তোমাদের কিছুই করতে পারবে না। সেইখানে গিয়ে তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।”

খামিসি বললে, “যো হুকুম।”

কুমার এগিয়ে এসে বললে, “সর্দার আমি কিন্তু পালানো-দলে নেই, পালাতে কোনদিন শিখি নি।"

রামহরি বললে, “কে পালাবে, আর কে পালাবে না, আমি তা জানতে চাই না! আমি কেবল খোকাবাবুর সঙ্গে থাকতে চাই।” এই বলে সে বিমলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

গাটুলা হেসে বললে, “আমি যা করব, তোমরাও তাই করবে। তোমরা যে পালাতে চাইবে না, সে কথা আমিও জানি!”

ইতিমধ্যে বনের ভেতর থেকে তাঁবুগুলো অদৃশ্য হয়েছে, এবং পেট্রোলের উজ্জ্বল লণ্ঠনগুলো চতুর্দিক আলোকিত করে তুলেছে!

শত্রুরা ততক্ষণে আরো কাছে এসে পড়েছে!

আলো দেখে তাদের চিৎকার, নৃত্য, আস্ফালন ও ঢাকের বাদ্য দ্বিগুণ হয়ে উঠল, দু-চারটে বন্দুকের আওয়াজও শোনা গেল।

বিমল বিরক্ত স্বরে বললে, “সর্দার, তোমার উদ্দেশ্য কী, আগে আমাকে বল।”

গাটুলা বললে, “আমাকে কিছুই বলতে হবে না। এখুনি যা হবে, চোখের সামনেই তুমি তা দেখতে পাবে।”

খামিসি তখন তার লোকজনদের নিয়ে চিৎকার করতে-করতে ছুটতে শুরু করেছে এবং আস্কারিরা মাঝে মাঝে শত্রুদের লক্ষ্য করে বন্দুকও ছুড়ছে!

গাটুলা বললে, “বিমলবাবু, এখন আমাদের এক-একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে লুকিয়ে পড়া উচিত। শত্রুরা আমাদের দেখতে পেলে সব কৌশলই ব্যর্থ হবে।”

বিমল, কুমার, রামহরি ও গাটুলা এক-একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। বাঘাও কুমারের সঙ্গ ছাড়লে না।

ঝোপের ভিতরে গা-ঢাকা দিয়ে বিমল দেখতে লাগল, খামিসির সঙ্গে তাদের নিজেদের লোকজনেরা যেই উল্টোদিকে পলায়ন শুরু করলে, শত্রুপক্ষের ভিতর থেকে অমনি একটা গগনভেদী জয়ধ্বনি জেগে সেই বিশাল অরণ্যকে কাঁপিয়ে তুললে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের গতি গেল বদলে । খামিসির লোকজনেরা যে-দিকে পালাচ্ছে, তারাও সেদিকে ছুটতে আরম্ভ করলে!

এতক্ষণে বিমল গাটুলার চাতুরি বুঝতে পারলে! গাটুলা বিনাযুদ্ধে ও রক্তপাতে কাবাগো-পাহাড়ে যাবার পথ পরিষ্কার করতে চায় । শত্রুপক্ষ এখন খামিসির দলের পিছনেই লেগে থাকবে এবং এই অবকাশে তারাও নিরাপদে-বিনা বাধায় কাবাগোর রক্ষিহীন রত্ন-গুহার দ্বারদেশে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবে।

গাটুলার এই আশ্চর্য চালাকি দেখে বিমল একেবারে অবাক হয়ে গেল! এবং এই বৃদ্ধ সর্দারের জন্যে তার মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির সঞ্চার হল।

রত্ন-গুহার যাত্রা-পথ পরিষ্কার হলে বটে, কিন্তু গাটুলার কথা যদি সত্য হয়, তবে সেই গুহার ভিতরে কোন-একটা অলৌকিক বিপদ নিশ্চয়ই তাদের

জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে! কী যে সেই বিপদ এবং কী করে যে সই বিপদ এড়িয়ে কেল্লা ফতে করে আবার তারা ফিরে আসবে এবং কেমন করে তখন আবার তারা দুই হাজার উন্মত্ত রক্ষী-সৈন্যকে বাধা দান করবে, বিমল বসে বসে সেই কথাই খালি ভাবতে লাগল।

এ-দিকে অরণ্য আবার ধীরে-ধীরে নীরবতায় ও অন্ধকারের নিবিড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আসছে!

বহু দূর থেকে ভেসে আসছিল কেবল একটা অস্পষ্ট গোলমাল ও মাঝে-মাঝে বন্দুকের শব্দ এবং একটা সুদীর্ঘ আলোক-রেখার আভাস। শত্রুরা খামিসির দলের পিছনে বোকার মত ছুটছে এবং কালকেও হয়তো এ ছোটাছুটি শেষ হবে না।

বিমল একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেললে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার পিছনেও কে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে ।

চমকে পিছনে ফিরে বিমল কিছুই দেখতে পেলে না, অন্ধকার শুধু কালো কষ্ঠি পাথরের মতন জমাট হয়ে আছে!

তার ডান পাশে কী একটা অস্পষ্ট শব্দ হল।বিমলও চট করে ফিরে বসল। চারিদিকে হাত বাড়িয়ে একবার হাতড়ে দেখলে, কিন্তু হাতে তার কিছুই ঠেকল না!

ঝোপের বাহির থেকে গাটুলার গলা শোনা গেল, "সবাই বেরিয়ে এস, পথ সাফ!"

বিমল উঠে দাঁড়াল এবং সেই সঙ্গেই প্রকাণ্ড একটা দেহ বিপুল বেগে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই অতর্কিত আক্রমনের টাল সামালাবার আগে বজ্রর মতন দু-খানা হাত তার টুঁটি টিপে ধরলে এবং প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিমল সেই অদৃশ্য বাহুপাশ থেকে আপনাকে মুক্ত করতে পারলে না,– দেখতে দেখতে তার দম বন্ধ হয়ে এল, তার দুই চোখ কপালে উঠল !

কিন্তু সেই অবস্থাতেও বিমল বুঝতে পারলে, যে তাকে ধরেছে সে জন্তুও নয়, মানুষও নয়, অথচ তার গায়ে ও হাতে জানোয়ারের মতন লম্বা-লম্বা লোম আছে।

ধীরে-ধীরে এই অমানুষিক শত্রুর সাংঘাতিক আলিঙ্গনের মধ্যে বিমলের সমস্ত জ্ঞাণ হারিয়ে গেল।

রত্ন গুহার বিভীষিকা

গাটুলা চেঁচিয়ে ডাকলে, "সবাই বেরিয়ে এস, পথ সাফ!"

কুমার, রামহরি ও সঙ্গে-সঙ্গে বাঘা ঝোপ ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল এবং তারপরেই ওরে বাপ্‌রে বলে বিকট এক আর্তনাদ করে একটা গাছের উপর থেকে কে মাটির উপরে সশব্দে আছড়ে পড়ল। সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, মানিকবাবু।

কুমার বললে, "একি মানিকবাবু, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?"

মানিকবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "ঐ গাছের ওপরে!"

–"গাছের ওপরে! কেন?"

শত্রুদের আসতে দেখে আমি ঐ গাছের ওপরে উঠে লুকিয়েছিলুম।...কিন্তু--"

--কিন্তু কী?"

মানিকবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "কিন্তু তখন কি আমি জানতুম যে, গাছের পাশের ঝোপেই ভূতের বাসা আছে?"

কুমার বললে, "কী আপনি বলছেন মানিকবাবু, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?" মানিকবাবু বললেন, "পাগল এখনো হই নি বটে, তবে আপনাদের পাল্লায় পড়ে আমার পাগল হতেও আর বেশি দেরি নেই বোধ হয় । আমি দেখলুম স্বচক্ষে ভূত, আর আপনি আমাকে বলছেন, পাগল ?"

—"যাক বাজে কথা। আপনি কী দেখেছেন আগে তাই বলুন!"

–"একটু আগেই মেঘের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলো ফুটেছিল। সেই আলোতে দেখলুম, ঐ ঝোপের ভেতর থেকে প্রকাণ্ড একটা কালো ভূত বেরিয়ে এক দৌড়ে কোথায় মিলিয়ে গেল!"

গাটুলা সেই ঝোপের ভেতরে ছুটে গেল এবং বিমলের মূর্ছিত দেহ কোলে নিয়ে তখনি আবার বাইরে বেরিয়ে এল ।

সকলের সেবা-শুশ্রুষায় জ্ঞান লাভ করে বিমল সব কথা খুলে বললে।

গাটুলা বললে, “জন্তুও নয় মানুষও নয় আর তার গায়ে জানোয়ারের মতো লম্বা লম্বা লোম! বুঝেছি, এ হচ্ছে সেই জীবটা-সিংহদমন গাটুলা সর্দারকে যে চুরি করতে এসেছিল।”

মানিকবাবু বললেন,"ভূত ভূত,–আ ভূত, মস্ত ভূত! আমি স্বচক্ষে দেখেছি!”

রামহরি আড়ষ্ট ভাবে বললে, “রাম, রাম, রাম, রাম!”

কুমার বললে, “এ আর কেউ নয়, সেই ঘটোৎকচ আবার আমাদের পিছনে লেগেছে!”

বিমল বললে, “কুমার, তুমি ঠিক বলেছে, এ নিশ্চয়ই সেই ঘটোৎকচ। এবারে আমি হেরেছি। সে এসেছিল গুপ্তধনের ম্যাপ নিতে--”

কুমার রুদ্ধশ্বাসে বললে, “তারপর?”

–“এবারে ম্যাপ সে নিয়েও গেছে!"

—“সর্বনাশ!"

সকলে খানিকক্ষণ নীরবে হতাশভাবে বসে রইল । গাটুলা আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, “ভেবেছিলুম আমরাই খুব চালাক! কিন্তু তা নয়, আমাদের আসল শত্রুরাও চালাকিতে বড় কম যায় না দেখছি। তারা গুপ্তধনের রক্ষীদের আমাদের পিছনে লেলিয়ে দিয়ে আমাদের দলবলকে এখান থেকে সরিয়েছে। তারপর ম্যাপ চুরি করে নির্বিবাদে গুপ্তধনের দিকে ছুটেছে।”

মানিকবাবু বললে, “আর আমাদের এখন কাদা ঘেঁটে, দেহ মাটি আর মুখ চুন করে খালি হাতেই ফিরতে হবে! আলেয়ার পিছনে ছুটলে এমনিই হয়!”

গাটুলা বললে, “কিন্তু বাবুজি, আমি এখনো হাল ছাড়ি নি। গুহার ভেতরে ভূতপ্রেত, দৈত্য-দানো কী আছে আমি তা জানি না, গুপ্তধন কোনখানে লুকানো আছে তাও আমি বলতে পারি না, কিন্তু সেই গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছবার এমন একটি গুপ্তপথ আমি জানি, যে-পথ দিয়ে গেলে শত্রুদের অনেক আগেই আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হতে পারব!”

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, “তবে তাই চল সর্দার, আর এক মিনিটও দেরি করা উচিত নয়!”

অন্ধকারের সঙ্গে অস্পষ্ট চাঁদের আলো মাখামাখি হয়ে গিয়ে বনের চারিদিকে তখন অদ্ভুত রহস্যের আবছায়া সৃষ্টি করেছে। বিমলরা উর্ধ্বশ্বাসে বনের পথ দিয়ে ছুটছে আর ছুটছে।

কাবাগো-পাহাড়ের উঁচু-নিচু কালো কালো চূড়োগুলো ক্রমেই চোখের খুব কাছেই এগিয়ে এল।

গাটুলা একটা ঘন বনের ভিতর ঢুকে বললে, “এখন আমাদের এই বনের ভেতর দিয়ে আধ মাইল পার হতে হবে । তার পরেই সামনে গুহায় ওঠবার পাহাড়ে-পথ পাব । তারপর চুপি-চুপি আবার বললে, “এ-বনকে সবাই এখানে ভূতের বন বলে থাকে, এর মধ্যে ভয়ে কেউ ঢোকে না ।”

টর্চের আলো জ্বেলেও পদে পদে হোঁচট খেয়ে খুব কষ্টে সকলে সেই জঙ্গলাকীর্ণ সংকীর্ণ পথ দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো--সে পথ কোন দিন চাঁদ-সূর্যের মুখ দেখে নি। সে পথের একমাত্র আত্মীয় হচ্ছে নিবিড় অন্ধকার এবং সেই অন্ধকারে বাস করে যে-সব অজ্ঞাত জীব, আচম্বিতে আজ এখানে মানুষের আবির্ভাব দেখে তারা সবাই মিলে অজানা ভাষায় কি যে কানাকানি করতে লাগল! হঠাৎ বিমলের পায়ে শক্ত কী ঠেক্‌লে, হেঁট হয়ে দেখলে, একটা নরকঙ্কাল।

কুমার বললে, “কিন্তু ওর মুণ্ডটা কে কেটে নিয়ে গেছে?”

যেন তার প্রশ্নের উত্তরেই কাছ থেকে কে বিকট স্বরে হেসে উঠল--হা হা হা হা হা হা হা হা -- সে হা হা অট্টহাসি যেন আর থামবে না!

টর্চের আলোতে দেখা গেল, একটা কঙ্কালসার উলঙ্গ ভীষণ মূর্তি ক্রমাগত হাসতে হাসতে যে দিক দিয়ে বিমলরা এসেছে, সেই দিকে ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছে। সে মূর্তি এতক্ষণ এই গভীর নিশীথে এই ভয়ানক স্থানে কী যে করছিল, কেউ তা বুঝতে পারলে না-- বুঝতে চেষ্টাও করলে না।

গাটুলা বিকৃত স্বরে তাড়াতাড়ি বললে, "এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!"

সবাই এগিয়ে চলল এবং পিছনে অনবরত উঠতে লাগল সেই বিশ্রী অট্টহাস্য!

হঠাৎ একটা ফর্সা জায়গায় বেরিয়ে এসে গাটুলা বলে উঠল, "ভূতের বন শেষ হল, ঐ হচ্ছে গুহায় ওঠবার পথ!"

সবাই দেখলে পঁচিশ-ত্রিশ হাত তফাতে দৃষ্টিপথ রোধ করে মস্ত একটা পাহাড়, তার নিচে অন্ধকার আর উপরে ম্লান চাঁদের আলো!

খোলা হাওয়ার হাঁপ ছাড়বার জন্যে মানিকবাবু ধপাস্ করে বসে পড়লেন, কিন্তু বিমল একটানে তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিয়ে কঠিন স্বরে বললে, "এখন জিরুবার সময় নয় মানিকবাবু! আসুন আমাদের সঙ্গে!"

গাটুলার পিছনে পিছনে সবাই পাহাড়-পথ ধরে উপরে উঠতে শুরু করলে।

কুমার শুধোলে, "আমাদের কতটা উপরে উঠতে হবে?"

গাটুলা বললে, "প্রায় হাজার ফুট। কিন্তু কথা কয়ে না, চুপি-চুপি ওঠ।"

খানিকক্ষণ সকলে নিঃশব্দে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল।

তারপর একটা বাঁকের মুখে এসে গাটুলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চুপি-চুপি বললে, "ঐ দেখ রত্নগুহার মুখ। .....গেলবারে সুরেনবাবুর সঙ্গে ঐ পর্যন্ত আসতে গিয়ে আমাদের দলের অনেক লোক মারা পড়েছিল কিন্তু তবু আমরা এর বেশি আর এগুতে পারি নি। এবারে গুহার রক্ষীরা বোকার মত খামিসির দলের পিছনে ছুটছে বলেই আমরা নিরাপদের এতটা আসতে পেরেছি,–নইলে দেখতে, গুহার ওঠবার পথে দলে দলে লোক পাহারা দিচ্ছে! এখনও একজন রক্ষী সামনে বসে আছে, দাঁড়াও, আগে ওকে শেষ করি!" এই বলেই গাটুলা তার বর্শা নিক্ষেপ করতে উদ্যত হল!

বিমল তাকে বাধা দিয়ে বললে,"সর্দার, অকারণ নরহত্যা কোরো না। লোকটা তো দেখছি বসে-বসেই ঘুমে ঢুলছে, ওর ব্যবস্থা করতে আমার দেরি লাগবে না।"

পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে গা মিলিয়ে বিমল নিঃশব্দে পায়ে এগিয়ে গেল, তারপর বাঘের মতন লাফ মেরে গুহার রক্ষীর উপর গিয়ে পড়ল এবং দেখতে-দেখতে তার মুখে কাপড় গুঁজে, হাত-পা বেঁধে ফেলে, তারপর তাকে তুলে আড়ালে সরিয়ে রেখে এল।

গুহার মুখ থেকেই দেখা গেল, ভেতরে ঘুট্ ঘুট্ করছে অন্ধকার ও থম্ থম্ করছে নিস্তব্ধতা।

এই সেই রত্ন-গুহা! যার সন্ধানে ঘরমুখো বাঙালির ছেলে পদে-পদে বিপদকে আলিঙ্গন করে পৃথিবীর এক-প্রান্ত থেকে আর-এক-প্রান্ত পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছে! এই সেই রত্ন-গুহা,যার মৃত্যু-ভরা অন্ধকার বুকের নিচে জ্বলছে সাত-রাজার ধন হীরামানিক। এই সেই রত্ন-গুহা, খানিকক্ষণ আগেও যার কাছে এসে দাঁড়াবার সম্ভাবনা পর্যন্ত ছিল না, তারই দ্বারা আজ অরক্ষিত অবস্থায় সামনে খোলা রয়েছে !

—"ভগবান, আমাদের রক্ষা করুন" বলে গাটুলা-সর্দার সেই জমাট অন্ধকারের গর্ভে সর্বপ্রথম প্রবেশ করলে।

তারপরে পরে-পরে ঢুকল বিমল, কুমার, রামহরি ও মানিকবাবু। তাদের প্রত্যেকের বা-হাতে টর্চ ও ডানহাতে রিভলভার। বাঘাও অবশ্য তাদের সঙ্গ ছাড়লে না।

গুহার মুখে পথ এত সরু যে, একজনের বেশি লোক পাশাপাশি যেতে পারে না। বিমল বুঝলে, এখানে একজন লোক দাঁড়ালে বাইরের অসংখ্য লোকের সঙ্গে একলাই যুঝতে পারে।

হঠাৎ তারা খুব একটা চওড়া জায়গায় এসে হাজির হল । উপরে টর্চের আলো ফেলে তারা দেখলে, ছাদ যে কত দূরে চলে গেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। তারপর টর্চের আলো সামনে-নিচের দিকে ফেলেই সকলে আঁৎকে ও চমকে উঠল!

সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি-সারি অগণ্য লোক! তাদের পরনে যোদ্ধার বেশ--কোমরে তরবারি, একহাতে ঢাল, আরেক হাতে চক্‌চকে বর্শা।

সামনে, বাঁয়ে ডাইনে যেদিকেই আলো পড়ে, সেই দিকেই যোদ্ধার পর যোদ্ধা,সংখ্যায় তারা কত হাজার, তা বুঝে ওঠা সম্ভব নয় !

এত লোক এখানে গায়ে-গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে আছে, তবু একটি টু শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। তাদের প্রত্যেকের মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাসে, চোখে পলকও নেই, কোন ভাবও নেই এবং দেহও একেবারে পাথরের মূর্তির মত স্থির ও নিশ্চল। উর্ধ্বে হস্ত তুলে ডান-পা বাড়িয়ে প্রত্যেকেই একসঙ্গে বর্শা নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে,কিন্তু কারুর হাত একটুও কাঁপছে না, বর্শার ডগাটুকু পর্যন্ত নড়ছে না !

সে এক বিভীষিকাময় অস্বাভাবিক দৃশ্য। তার সামনে দাঁড়ালে অতি বড় সাহসীর বুকও ভয়ে নেতিয়ে পড়বে!

রত্ন গুহার জাগরণ

টর্চের আলো নিবিয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে প্রায় দম বন্ধ করে অনেকক্ষণ তারা অপেক্ষা করলে,—কিন্তু গুহার ভিতরে কোনরকম শব্দ শোনা গেল না। তারা প্রতিমুহূর্তে আশা করছিল, শত-শত তীক্ষ্ণ বর্শা বা তরবারির তীব্র আঘাত, কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও কেউ তাদের আক্রমণ করলে না!

চারিদিক এত নিঃশব্দ যে, কেউ সন্দেহই করতে পারবে না, রণসাজে সজ্জিত হাজার-হাজার যোদ্ধা এই বিরাট গুহার মধ্যে শত্রুসংহারের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে! অস্বাভাবিক সেই নিঃশব্দতা!

সে অনিশ্চয়তা সহ্য করতে না পেরে বিমল আবার টর্চ জ্বেলে তার আলো চতুর্দিকে নিক্ষেপ করলে।

আশ্চর্য, আশ্চর্য শত্রুরা কেউ এক পদও অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ হয় নি, তাদের মুখের ভাব ও দেহের ভঙ্গি ও একটুও বদলায় নি, ঠিক তেমনি করেই বর্শা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির মতো!

এও কি সম্ভব! অবাক ও হতভম্ব হয়ে সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

বিমল রিভলবারটা বাগিয়ে ধরে দুপা এগিয়ে গেল,—শত্রুদের জনপ্রাণীর দেহে তবু এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

তবে?...তবে কি এরা মানুষ নয়। তবে কি সত্যিই এরা যখ...রত্ন-গুহার প্রেতরক্ষী, গাটুলা-সর্দারের মুখে যাদের কথা তারা শুনেছিল ?

হঠাৎ গাটুলা-সর্দার বলে উঠল, “হয়েছে। এতক্ষণে মনে পড়েছে! ওরে আমার পোড়া মন, বুড়ো হয়ে তুই সব ভুলে যাস্?”

–“কী মনে পড়েছে, সর্দার?”

—"এদেশের এক অদ্ভুত রীতি আছে। গুহার বাইরে যে-সব রক্ষী-সৈন্য পাহারা দেয়, বেঁচে থাকতে তারা এই গুহার ভেতরে ঢুকতে পায় না। কিন্তু তাদের মৃত্যু হলে পর তাদের দেহকে গুহার ভেতরে নিয়ে আসা হয়। তারপর প্রাচীন মিশরে যে উপায়ে মমি তৈরি করা হতো তেমনি কোন উপায়ে তাদের চিরদিনের জন্যে রক্ষা করা হয় ....এদের কথা অনেকদিন আগেই শুনেছিলুম, কিন্তু এতক্ষণ সে কথা আমার মনে পড়ে নি। ওরে আমার পোড়া মন, খ্যাঁক থুঃ, তোর গলায় দড়ি, গলায় দড়ি।"

মানিকবাবু এতক্ষণ আতঙ্কে দুই চোখ মুদে, অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে ভেবে মনে মনে ইষ্টদেবতার নাম জপছিলেন; এখন গাটুলার কথা শুনে সহসা চোখ খুলে বললে, "তাহলে সামনে যাদের দেখছি, তারা জ্যান্ত মানুষ নয়,-মমি?"

রামহরির দুই চোখ তখনো কপালে উঠেই আছে! সে বললে, "মামি! জ্যান্ত মানুষ নয়, মামি! ওরে বাবা, মামি আবার কোন দেশি ভূত গো?"

মানিকবাবু সগর্বে বললেন, "আহা, মামি নয়, মামি নয়, –মমি । বাঘ-সিঙ্গির দেহকে জিইয়ে বৈঠকখানায় সাজিয়ে রাখা হয় দেখেছ তো। মমিও তেমনি মরা-মানুষের জিয়ানো দেহ! তোমার কিছু ভয় নেই রামহরি, তুমি শান্ত হও আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমি কি একটুও ভয় পেয়েছি?"

রামহরি বললে, "ভয়? ভয় আমি আর কারুকে করি না, ভয় করি খালি ভূতকে! খোকাবাবু জানে, আমার এই বুড়ো হাড়ে এখনো ভেল্কি দেখাতে পারি,— দু-চারটে জোয়ান পাঁঠাকে এখনো কুপোকাত করবার জোর আমার আছে। কিন্তু ভূতের কাছে তো আর গায়ের জোর খাটে না, কাজেই সেইখানেই আমি বেজায় কাবু!"

কুমার বললে, "ও-সব বাজে কথা যেতে দাও । এ গুহা তো দেখছি, প্রকাণ্ড ব্যাপার, এর কোথায় কি আছে তা বুঝে ওঠা কঠিন। এখন আমাদের কর্তব্য কী?"

গাটুলা বললে, “আগেই বলেছি, গুহার ভেতরের কথা আমিও কিছুই জানি না! তবে শুনেছি এ গুহা নাকি অনন্ত গুহা, এর শেষ নেই! এর মধ্যে নাকি মন্দির আছে, ঘরবাড়ি আছে, রত্নভাণ্ডার আছে, পথ-বিপথ আছে, আর এখানে বাস করে যারা, তারা মানুষ না যক্ষ না রক্ষ, তাও আমি বলতে পারি না। গুহায় ঢুকেই তো এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলুম—মৃত যোদ্ধার বিভীষিকা এমন আরো কত বিভীষিকা যে এই বারে সিংহদমন গাটুলা-সর্দারকে ভয় দেখাবে তা কে বলতে পারে?”

বিমল বললে, “তাইতো, এবারে কোন দিকে যাব,–এ ভীষণ আঁধারপুরীতে পথের সন্ধান দেবে কে? হায় হায়, এই সময়ে ম্যাপখানা যদি কাছে থাকত।”

বিমলের মুখের কথা শেষ হতে-না হতেই বাহির থেকে গুহা মুখের গলিপথে অনেকগুলো টর্চের আলো এসে পড়ল!

গাটুলা বললে, “নিশ্চয় আমাদের শত্রুরা এইবারে আসছে।”

—“শত্রুরা?”

–“হ্যাঁ, যারা ম্যাপ চুরি করেছে তারা। এখন আমরা লুকোই কোথায়?”

বিমল টপ্ করে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, “এস আমরা ঐ মরা যোদ্ধাদের দলে ঢুকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকি গে।”

সকলে তাড়াতাড়ি সেই মৃত যোদ্ধাদের দলে গিয়ে ভিড়ে পড়ল এবং তাদের আড়ালে লুকিয়ে থেকে শত্রুদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্পক্ষণ পরেই বাহির থেকে এ-লোকগুলো ভেতরে এসে ঢুকল, আন্দাজে বোঝা গেল, সংখ্যায় তারা চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের কম হবে না। তাদের দলে দশবারোটা টর্চ আছে, কিন্তু তাদের আলো পড়ছে সামনের দিকে, কাজেই কারুর মুখ দেখা যাচ্ছে না।

কুমার চুপি-চুপি বললে, "ও-দলে খোঁজ নিলে নিশ্চয়ই মানিকবাবুর গুণধর কাকা মাখনবাবুকে তার বন্ধু ঘটোৎকচকে, আর সেই রামু রাস্কেলকে দেখতে পাওয়া যাবে।"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, আমারও সেই বিশ্বাস!"

--শত্রুদল ভেতরে ঢুকেই সেই সহস্র সহস্র আক্রমণোদ্যত যোদ্ধার মূর্তি দেখে প্রথমে থমকে দাড়িয়ে পড়ল মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে; তারপরেই বামদিকে মোড় ফিরে সকলে মিলে এগিয়ে চলল ।

বিমল বললে, "দেখছ, ওরা এ মূর্তিগুলোকে দেখে ভয় পেলে না? নিশ্চয়ই ওরা আগে থাকতে সব সন্ধান নিয়ে এসেছে। তারপর দেখে, সকলের আগে টর্চ হাতে করে একটা লোক যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, ও লোকটাই হচ্ছে দলের সর্দার মাখনবাবু। ওর কাছেই ম্যাপ আছে, তাই সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!.. দেব নাকি গুলি করে ওর মাথার খুলি উড়িয়ে?"

কুমার বলল, "না না, ওরা দলে খুব ভারি, একজনকে মেরে লাভ কী? তার চেয়ে চল, তফাতে থেকে আমরাও ওদের পিছনে-পিছনে যাই, তাহলে আর আমাদের ভাবনা থাকবে না, ওরাই আমাদের পথপ্রদর্শকের কাজ করবে!"

বিমল কুমারের পিঠ চাপড়ে বললে, "তুমি ঠিক বলেছ। সর্দারের মত কী?"

গাটুলাও কুমারের প্রস্তাবে সায় দিলে! মানিকবাবু বললেন, "বাপুরে ঘটোৎকচ যদি দেখতে পায়?"

বিমল বললে, "তাহলে আপনি এইখানে বসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করুন!"

মানিকবাবু বললেন, "একলা? ও বাবা, বলেন কী? তার চেয়ে আপনাদের সঙ্গে যাওয়াই ভালো! আর আমি কারুকে ভয় করব না। এবার আমিও মরিয়া

হয়ে উঠব! প্রাণ যখন যাবেই, তখন আর ভয় পেয়ে লাভ কী। চলুন, কোথায় যাবেন চলুন!”

সকলে অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রবর্তী দলের টর্চের আলো লক্ষ করে অগ্রসর হল । প্রায় দশ মিনিট এইভাবে অগ্রসর হবার পর দেখা গেল, শত্রু দলের টর্চের আলো একে-একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

গাটুলা বললে, “বোধ হচ্ছে ওরা যেন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে!” শত্রুদের আলোর চিহ্ন যখন একবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, বিমল তখন নিজের টর্চের আলো মাটির উপরে ফেলে আবার এগুতে লাগল।

খানিক এগিয়েই দেখা গেল, পাহাড়ের গায়ে খোদা সুদীর্ঘ এক সিঁড়ির সার প্রায় চারতলা নিচে নেমে গেছে কিন্তু সেখানে শত্রুদের কোন সাড়াশব্দই নেই।

ধীরে ধীরে অন্ধকারেই তারা সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে লাগল, সিঁড়ির নিচে গিয়েও শত্রুদের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। চারিদিকে বিদ্যুতের মত টর্চের আলোক রেখাকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বিমল দেখলে, তারা প্রকাণ্ড এক লম্বা-চওড়া উঠানের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। উঠানের পরেই দালান ও সারবন্দী ঘর ও মাঝে মাঝে এক-একটা পথ । কিন্তু শত্রুরা কোন পথে গেছে?

তারা হতাশভাবে সেইখানেই মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে রইল। চুপি চুপি অনেক পরামর্শের পরও স্থির করতে পারলে না, তারা কোন দিকে যাবে এবং শত্রুরা কোন দিকে গেছে!

আচম্বিতে সেই বিরাট রত্ন-গুহার নিদ্রা-স্তব্ধতা ভেঙে গেল!

প্রথমেই শোনা গেল আট-দশটা বন্দুকের অগ্নি-উদ্‌গারের শব্দ এবং তারপরেই হঠাৎ শত শত সিংহের প্রাণ-চমকানো গম্ভীর গর্জন সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ঘণ্টার ধ্বনি, অগণ্য মানুষের চিৎকার ও আর্তনাদ। সারা গুহা থর থর করে কাঁপতে লাগল। অন্ধকারের ভিতরেই প্রাঙ্গণের চারিদিককার দরজা খোলার শব্দ

হতে লাগল,—এদিকে ওদিকে সেদিকে দলে দলে মানুষের-না কাদের পদশব্দ শোনা যেতে লাগল!

গাটুলা সর্দার বলে উঠল-- "আর নয়, যদি বাঁচতে চাও তো পালাও! গুহার যখেরা জেগে উঠেছে; ঐ শোনা, শত-শত সিংহ চিৎকার করতে করতে এদিকে এগিয়ে আসছে, যারা ভেতরে গেছে তারা আর ফিরবে না আমরাও ভেতরে থাকলে আর বাইরের আলো দেখতে পাব না,.এস, এস, পালিয়ে এস।"

গাটুলার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই দ্রুত পদে সিঁড়ি দিয়ে আবার উপরে উঠল এবং মাঝে মাঝে—আলো জেলে যে পথ দিয়ে এসেছে সেই পথ ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল......খানিক পরেই বুঝতে পারলে, অনেক তফাতে তাদের পিছনেও আরো কারা বেগে ছুটে আসছে। তারা কারা?

শত-শত সিংহের গর্জন, হাজার হাজার মানুষের কোলাহল, অসংখ্য ঘণ্টাধ্বনি সেই রহস্যময় রত্নময় রত্ন-গুহাকে তখনো তোলপাড় করে তুলছে কিন্তু বন্দুকের শব্দও বহুকণ্ঠের আর্তনাদ আর শোনা যাচ্ছে না!

এই তো গুহার মুখ। তারপরেই বাহিরের মুক্ত আকাশ! কিন্তু চাঁদের আলো তখন নিভে গেছে এবং শেষ-রাতের পাতলা অন্ধকারের ভিতরে আসন্ন ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে!

বিমল বললে, "ঐ বড় পাথরখানার আড়ালে সবাই লুকিয়ে পড়ি এস! পিছনের পায়ের শব্দ খুব কাছেই এসে পড়েছে!"

তারা পাথরখানার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই গুহার ভিতর থেকে পর পর তিনটি মূর্তি বেরিয়ে এল, ঝড়ের মতো। বাইরে এসে তারা এক মুহূর্তও থামল না, সোজা গিয়ে পাহাড় থেকে নামবার পথ ধরলে!

পাতাল অন্ধকারে ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু সর্বশেষে যে পাহাড় থেকে নামবার পথ ধরলে, তার চেহারার অস্বাভাবিকতা সকলেরই চোখে পড়ে গেল! যেমন লম্বা তেমনি চওড়া তার দেহ, গায়ের রং তার যেন অন্ধকারের

সঙ্গে মিশে যাচ্ছে এবং তার সর্বাঙ্গে এক টুকরো কাপড়ও নেই! সেই অদ্ভুত মূর্তির কাঁধের উপরে বড় বাক্সের মত কী একটা যেন রয়েছে!

বিমল বললে, "কুমার! কুমার! ঐ দেখ ঘটোৎকচ যাচ্ছে, ঐ দেখ ঘটোৎকচ যাচ্ছে। কাঁধে ও কী নিয়ে যাচ্ছে?— গুপ্তধন ?–কুমার ! কুমার আজ ঘটোৎকচের একদিন কি আমারই একদিন!"—বলতে-বলতে বিমল একলাফে পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল!

পাপের ফল

বিমল পাহাড় থেকে নামবার উপক্রম করতেই গাটুলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দুই হাতে তার দুই কাঁধ চেপে ধরে বললে, "না বাবু, এখনও রত্ন-গুহার সীমানা আমরা ছাড়াই নি, এখানে গোলমাল করা আর যেচে গলায় ফাঁসি দেওয়া একই কথা।"

বিমল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে উত্তপ্ত স্বরে বললে, "না সর্দার! তুমি আমাকে ছেড়ে দাও! তুমি জানো না, ঐ ঘটোৎকচ কতবার আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে! ও যেন আলেয়া, ওকে দেখা যায়, ধরা যায় না। ও যে কি, মানুষ, না জন্তু, না প্রেত তাও আমরা জানি না! আজ ওকে আমি ধরবই ধরব,–সকল রহস্য ভেদ করব।"

হঠাৎ নিচ থেকে একাধিক কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ জেগে উঠল!

কুমার ও রামহরি চমকে একসঙ্গে বলে উঠল, "ও কী-ও কী!"

খানিকটা নেমেই দেখে, ভীষণ ব্যাপার! রক্তগঙ্গার মাঝখানে দুটো দেহ পড়ে রয়েছে, একটা দেহ একেবারে স্থির এবং একটা দেহ তখনো ছটফট করছে।

যে ছটফট করছিল তাকে দেখেই মানিকবাবু কাতরস্বরে বলে উঠলেন, "অ্যাঁ, ছোটকাকা! ছোটকাকা!'

আহত লোকটির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে গাটুলা বললে, “হু, চিনতে পেরেছি! এ যে দেখছি সুরেনবাবু হুজুরের ভাই মাখনবাবু !”

মাখনবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে অতি কষ্টে বললেন, “আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না,— রক্তে আমার দুই চক্ষু বন্ধ হয়ে গেছে ! কিন্তু আমি বুঝতে পারছি তোমরা কে! তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, তার ফলে নিজেও মরতে বসেছি,– তোমরা আমাকে ক্ষমা কর ।”

মাখনবাবুকে জড়িয়ে ধরে মানিকবাবু বললেন, “আপনার এ-দশা কে করলে, ছোটকাকা?” -

—“ঘটোৎকচ। আমাকে আর রামুকে সে ছোরা মেরেছে।”

--ছোরা মেরেছে! কেন?"

—“গুপ্তরত্ন সে একলাই ভোগ করতে চায়।”

বিমল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, 'গুপ্তধন! আপনারা কি গুপ্তধন পেয়েছেন?”

—“পেয়েছি, কিন্তু গুহায় যা আছে, তার তুলনায় যা পেয়েছি তা যৎসামান্য। সে গুহায় যা আছে, কুবেরের ভাণ্ডারেও বোধহয় তা নেই! কিন্তু সে হচ্ছে ভূতুড়ে গুহা। আমার সঙ্গীরা প্রায় সবাই মারা পড়েছে! একটা বাক্স নিয়ে কোন গতিকে আমি, রামু আর ঘটোৎকচ প্রাণ নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়েছি বটে, কিন্তু এখন রামুও মরেছে আমারও মরতে দেরি নেই! ঘটোৎকচ। বিশ্বাসঘাতক ঘটোৎকচ রত্নের বাক্স নিয়ে আমাদের মেরে সে পালিয়েছে! উঃ, সে বাক্সে যা আছে, তা দিয়েও একটা রাজ্য কেনা যায়! কিন্তু সে পাপের ফল আমার ভোগে এল না। আমাকেই নরকে যেতে হচ্ছে! উঃ! উঃ! গেলুম-গেলুম! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে-মানিক-মানিক--” বলতে-বলতে মাখনবাবু ধনুকের মতো বেঁকে গেলেন,—তারপরেই মাটিতে সিধে হয়ে আছড়ে পড়ে একেবারে স্থির হয়ে রইলেন।

ঘটোৎকচ আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালাল! এতক্ষণে যে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে, আর তাকে ধরতে পারব না!

কুমার এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললে, "কিন্তু সর্দার, গাটুলা সর্দার কোথায় গেল?"

বিমল বলে উঠল, "হুশিয়ার গাটুলা-সর্দার। নিশ্চয় সে ঘটোৎকচের পিছু নিয়েছে, চল চল, দৌড়ে চল।"

মানিকবাবু করুণ স্বরে বললেন, "কিন্তু আমার কাকার মৃতদেহ? তার সৎকারের কী হবে?"

বিমল দ্রুতপদে পাহাড় থেকে নামতে-নামতে বললে, "শয়তানের মড়ার সৎকার করবে শেয়াল-কুকুরেরা। চলে আসুন!"

ঘটোৎকচ রহস্য

পাহাড় থেকে নেমেই দেখা গেল, আর-এক ভয়ানক দৃশ্য!

তখন ভোরের আলো এসে উষার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে এবং বনের গাছেগাছে পাখিদের গানের আসর বসেছে।

কিন্তু এমন সুন্দর প্রভাতকেও বিশ্রী করে দিলে সামনের সেই বীভৎস দৃশ্য!

ভূমিতলে চিৎ হয়ে পড়ে প্রাণপণে যুঝছে গাটুলা-সর্দার এবং তার বুকের উপরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে বিপুলদেহ দানবের মত প্রকাণ্ড একটা গরিলা ।

কুমার চেঁচিয়ে উঠল,—"গরিলা, গরিলা! সর্দারকে গরিলায় আক্রমণ করেছে- গুলি কর!"

চিৎকার শুনেই গরিলাটা গাটুলাকে ছেড়ে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল এবং সামনেই বিমলকে দেখে ভীষণ এক চিৎকার করে মহাবিক্রমে তাকে আক্রমণ করলে!

এখন, যারা 'যখের ধন' পড়েছেন তারাই জানেন বিমলের শারীরিক ক্ষমতার কথা। সে কুস্তি, যুযুৎসু ও বক্সিংয়ে সুদক্ষ,–সে অসুরের মতো বলবান। যদিও সে জানত গরিলায় গায়ের অমানুষিক শক্তির সামনে পৃথিবীর কোন মানুষই দাঁড়াতে পারে না, তবুও সে কিছুমাত্র ভয় পেলে না। কারণ, ভয় তার ধাতে নেই।

এই বৃহৎ গরিলাটার অতর্কিত আক্রমণে বিমল প্রথমেই মাটির উপরে ঠিকরে পড়ে গেল; কিন্তু শত্রু তাকে দ্বিতীয়বার ধরবার আগেই বিমল ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে গরিলার মুখের উপরে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিয়ে স্যাঁৎ করে একপাশে সরে গেল ।

কিন্তু ঘুষি খেয়েও গরিলাটা একটুও দমল না, দু-হাত বাড়িয়ে বিমলকে জড়িয়ে ধরতে উদ্যত হল। এবারে বিমল যুযুৎসুর এক প্যাঁচ কষলে এবং চোখের নিমেষে যেন কোন মন্ত্রশক্তিতেই গরিলার সেই বিশাল দেহ, গোড়া-কাটা কলাগাছের মত ভূমিসাৎ হল।

আহত গাটুলা-সর্দার রক্তাক্ত দেহে মাটির উপরে দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বললে, “সাবাস বাবুজি! বহুৎ আচ্ছা। মরদ-কা বাচ্চা।”

কুমার রিভলভার তুলে গরিলাটাকে গুলি করতে উদ্যত হল। বিমল বললে, “এখন মেরো না কুমার আগে দেখা যাক মানুষ জেতে, না, গরিলা জেতে? এ-এক অদ্ভুত লড়াই!”

ভূপতিত গরিলাটা মাটির উপরে শুয়ে শুয়েই বিদ্যুতের মতো সড়াৎ করে খানিকটা সরে গিয়ে হঠাৎ বিমলের পা দুটোকে জড়িয়ে ধরলে,—সঙ্গে সঙ্গে বিমলকে ধরাশায়ী হতে হল। তারপরে শুরু হল এক বিষম ঝটাপটি,—কখনো বিমল উপরে আর গরিলা নিচে, কখনো বিমল নিচে আর গরিলা উপরে, কখনো দুজনেই জড়াজড়ি করে মাটিতে গড়াগড়ি দেয় এবং ওরই মধ্যে ঘুষি, চড়, কিল, লাথি কিছুই বাদ গেল না!

সকলে অবাক ও স্তম্ভিত হয়ে সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখতে লাগল, তখন গরিলাটাকে আর গুলি করবারও উপায় ছিল না -- কারণ, সে গুলি গরিলাটার গায়ে না লেগে বিমলেরই গায়ে লাগাবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট! কেবল বাঘা ঘেউ-ঘেউ করে বকতে-বকতে ছুটে গিয়ে গরিলাটাকে কামড়ে দিতে লাগল।

সবাই কী করবে তাই ভাবছে, এমন সময়ে বিমল হঠাৎ কী কৌশলে সেই মস্ত বড় গরিলার দেহটা পিঠের উপরে নিয়ে স্প্রিং টেপা পুতুলের মত টপ্ করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং কারুর চোখে পলক পড়ার আগেই গরিলাটাকে ছুঁড়ে প্রায় সাত-হাত তফাতে ফেলে দিলে!

গাটুলা চেঁচিয়ে উঠল, “বাহবা বাবুজি! বাহবা বাবুজি, বাহবা বাবুজি!”

মাটির উপরে দুহাত তুলে সশব্দে আছড়ে পড়ে গরিলাটা আর নড়ল না। বাঘার ঘন ঘন কামড়েও তার সাড়া হল না, সবাই বুঝল তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে।

বিমল অবসন্নের মত মাটির উপরে বসে পড়ল- তার মুখ ও গা দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে। রামহরি তাড়াতাড়ি তার সেবায় লেগে গেল। কুমার বললে, "সর্দার এ গরিলাটা কোত্থেকে তোমায় আক্রমণ করলে?"

বিমল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "গরিলা তো সর্দারকে আক্রমণ করে নি, সর্দারই গরিলাকে আক্রমণ করেছে।"

গাটুলা সবিস্ময়ে বললে, "তুমি কী করে জানলে বাবা?"

বিমল বললে, "কারণ, আমি গোড়া থেকেই সন্দেহ করছি, ঘটোৎকচ হচ্ছে একটা পোষা গরিলা। ঐ দেখ গুপ্তধনের বাক্স যা নিয়ে ঘটোৎকচ পালাচ্ছিল।"

কুমার বললে, "আমি তো শুনেছি গরিলা পোষ মানে না।"

বিমল বললে, "আমিও তাই জানতুম, কিন্তু এখন দেখছি সে-কথা ঠিক নয়।"

কুমার খুঁৎ-খুঁৎ করতে করতে বললে, "বিমলের এক আছাড়ে গরিলার মত বলবান বুনো জন্তু কখনো মরতে পারে? আর হাজারই পোষ মানুক গরিলা জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়, ধনরত্নের লোভে কি গরিলা মানুষ খুন করে?" বলতে বলতে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গরিলার মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সচকিত বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মৃতদেহের পানে তাকিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠল, "শীগ্‌গির এস। তোমরা সবাই দেখে যাও!"

সকলে কৌতুহলী হয়ে ছুটে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলে, গরিলার কাঁধের উপর থেকে গরিলার মুখের চামড়া সরে গিয়েছে এবং ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে যে কালো কুৎসিত মরা-মানুষের মুখখানা, মাংসহীন মড়ার মাথার দাঁত

গুলো যেমন বেরিয়ে থাকে, তারও দুই পাটি দাঁত তেমনিভাবে ছরকুটে বাইরে বেরিয়ে আছে--কারণ, তার উপরের আর নিচের দুই ঠোঁটই না জানি কবে কোন দুর্ঘটনায় কেমন করে উড়ে গিয়েছে।

বিমল বললে, "অ্যাঁঃ-- কি আশ্চর্য! এ যে দেখছি জাহাজের সেই মরা দেঁতো ঢ্যাঙা কাফ্রিটার মুখ।"

মানিকবাবু বললেন, "ও বাবা, এই ব্যাটাই তাহলে গরিলার চামড়া মুড়ি দিয়ে ঘটোৎকচ সেজে এতদিন আমাদের ভয় দেখিয়ে আসছে!"

বাক্সের ডালা খুলে দেখা গেল, তার ভিতরটা রাশি রাশি হীরা-চুনী-পান্না ও মুক্তোর জেল্লায় ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করছে-- এত মূল্যবান ঐশ্বর্য তারা কেউ কোনদিন একসঙ্গে দেখবার কল্পনাও করেনি।

বিমল বললে, "কিন্তু মাখনবাবুর মুখে শুনেছ তো, গুহায় যা আছে তার তুলনায় এ ঐশ্বর্য যৎসামান্য মাত্র! আমরা শুধু-হাতে ফিরছি না বটে, কিন্তু সে গুহার কোন গুপ্তকথাই জানা হল না! সেই ঘুমন্ত গুহার অন্ধকার থেকে অমন হাজার হাজার কণ্ঠে চিৎকার জাগল কোত্থেকে, কেনই-বা শত শত সিংহ গর্জন করছিল আর অত ঘণ্টা বাজ্‌ছিল, আর কেনই বা মাখনবাবু ভয় পেয়ে পালিয়ে এলেন, আর কেনই বা সে গুহাকে ভূতুড়ে গুহা বললেন, সে-সব কিছুরই তো কিনারা করা হল না!"

রামহরি বললে, "থাক্ - থাক্ , যা জেনেছ তাই-ই যথেষ্ট, আর বেশি কিছু জানতে হবে না। এখন প্রাণ নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চল !"

বিমল হেসে বললে, "না রামহরি, এ-যাত্রায় আর বেশি কিছু জানা চলবে না - গুহার যখেরা সব সজাগ হয়ে আছে। কিন্তু এক বৎসর পরে হোক্, আর দু'বৎসর পরেই হোক, গুহার রহস্যেভেদ করবার জন্যে আবার আমরা নিশ্চয়ই আসব,–কী বল কুমার?"

কুমার বললে, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

মানিকবাবু বললেন, "ও বাবা, বলেন কী! এই আমি নাক মল্‌ছি, কান মল্‌ছি -- এ জীবনে এ-মুখো আর কখনো হব না! দয়া করে আর আমাকে ডাকবেন না, কারণ, ডাকলেও আর আমার সাড়া পাবেন না।"

গাটুলা বললে, "বাবুজি! আবার যদি আপনারা এখানে আসেন আর সিংহদমন গাটুলা-সর্দারকে যম যদি চুরি করে না-নিয়ে যায় তাহলে ঠিক তাকে আপনাদের সঙ্গে দেখতে পাবেন । আমি সাহসীর গোলাম!"

আচম্বিতে সকলের কান গেল আর-একদিকে ।

দুম্-দুম্-দুম্-দুম্-দুম্-দুম্-দুম্! যেন চার-পাঁচশো ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে তালে তালে পা ফেলে কারা যেন এগিয়ে আসছে। ধুপ্-ধুপ্-ধুপ্-ধুপ্-ধুপ্ -ধুপ্-ধুপ্ ! সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেন কাঁপতে লাগল - ঢিপ্-ঢিপ্ ঢিপ্-ঢিপ্ ঢিপ্-ঢিপ্ ঢিপ্-ঢিপ্! পৃথিবীর বুকের উপর পড়ছে হাজার-হাজার সৈনিকের পা!

গাটুলা-সর্দার দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "আর এখানে নয়! রত্ন-গুহার রক্ষীরা ফিরে আসছে।"

সমাপ্ত